শেষের খুব কাছে

সমরেশ মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

উৎসর্গীকৃত

শেষের
খুব
কাছে

হুহু করে বোম্বে মেল হাওড়ার দিকে ছুটে চলছিল। এখন মধ্যরাত, কামরায় অঢেল ঘুম। থ্রি টিয়ার কামরার যাত্রীরা নিঃসাড়ে পড়ে আছে যে যার জায়গায়। লাইন আর চাকার ঘর্ষণে যে শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করছে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সবাই। শুধু একজন যাত্রী ঠোঁটে সিগারেট জেবলে যাচ্ছিল একের পর এক। আসার পথে আধশোয়া অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকার পর সে নিচে নামল। ছুটন্ত ট্রেনের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে সে হাত বাড়িয়ে মাঝের বার্থ ধরে নিজেকে সামলালো। এই অবস্থাতেও তার ঠোঁটের সিগারেট একটুও কাঁপল না। ঘুমন্ত যাত্রীদের দিকে তাকাল সে। না, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না।

প্যাসেজে ঠিকঠাক পা রাখা যাচ্ছে না ট্রেনের গতির জন্যে। টলতে টলতে সে বন্ধ দরজার কাছে চলে এল। চেকার লোকটিকে সে দেখতে পেল না। বোম্বে ছাড়ার সময় এই লোকটির চেহারা বাঘের মত ছিল, যত ট্রেন এগোচ্ছে তত একটু একটু করে বেড়াল হয়ে যাচ্ছে। সে টয়লেটের দরজা খুলল। ভারতীয় রেলের টয়লেটে ট্রেন চলতে শুরু হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে দুর্গন্ধ তৈরী হয়ে যায় তা এখানে নেই। দরজাটা বন্ধ করে সামনের দিকে তাকাতেই আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল সে। আশ্চর্য, আয়নাটাও খারাপ কাচের নয়।

গালে হাত বোলাতেই কনুই-এর ওপরটা আয়নায় নজরে এল। নীল জলপরী। অনেক সময় নিয়ে চিরজীবনের জন্যে এঁকে দিয়েছে বোম্বের এক উল্কিওয়ালা। বন্ধুরা বলেছিল, সমুদ্রে একা থাকতে নেই। মাঝ সমুদ্রে মধ্যরাত্রে কোন অবিবাহিত যুবক ডেকে হাঁটলেই নাকি সমুদ্র তাকে তীব্র আকর্ষণ করে। মেয়েছেলে নিয়ে যাওয়ার হুকুম যখন নেই তখন হাতে উল্কি এঁকে নাও। কেউ বুকেও আঁকায়। বুক ভরা জলপরী। তার ভাল লাগেনি। রক্তমাংসের কেউ যদি কখনও আসে তবে তার আপত্তি হবে ওই বুকে মাথা

রাখতে। নীল জলপরীকে অঙ্গে এঁকে নিতে বড্ড কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তারপর, তার অনেকদিনের পর, ধূধূ সমুদ্রে একা দাঁড়িয়ে যখন নিজের বাইসেপের দিকে তাকিয়েছে তখনই সেই সুন্দরী চুপচাপ হেসে গেছে তার দিকে চেয়ে। সেই হাসি দেখতে দেখতে নিজেই মোহিত হয়েছে সে, সময় কেটেছে সময়ের মত।

একদা গায়ের চামড়া ফর্সা ছিল। বেশ ফর্সা। ছয়ফুট শরীরটায় মেদ নেই এখনও কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে নীলের মনে হল তার বয়স বেড়েছে। এমনও হতে পারে দিন তিনেকে বেড়ে ওঠা দাড়ি তার বয়সটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু চোখের তলা, কপালে এবং গলার ওপরের অংশ আর আগের চেহারায় নেই। চুলও উঠেছে বিস্তর, ঠাওর করলে দু-একটা রুপোলি যে পাওয়া যাবে না তা নয়। ডিসুজার কথা মনে পড়ল। জাহাজে ডিসুজাকে সে বন্ধুই মনে করত। ওর হবি ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হরেকরকম জাতের মেয়েদের ছবি জমানো। ছটা এ্যালবাম ছিল ডিসুজার। পাঁচ মহাদেশের মেয়েদের জন্যে আলাদা আলাদা শ্রেণীবিভাগ ছিল পাঁচটায়। সেই ডিসুজা কোন বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই চুলে কলপ করতে লেগে যেত। জুলপি এবং সামনেটা যখন যুবকের আদল পেয়ে যেত তখন শিস দিতে দিতে জাহাজ ছেড়ে শহরে পা দিত। বেচারা নিজের মাথার পেছনটা দেখতে পেত না। সাদা চুলগুলো খোঁচা খোঁচা হয়ে যেন বিদ্রূপ করত। এ ব্যাপারে ওকে সতর্ক করে দিলে ডিসুজা হাসত, 'কোন মেয়েকে আমি পেছনে ফেলে রাখি না। মেয়েরা থাকবে সামনে। মুখোমুখি। অতএব সমস্যা নেই। যখন ফিরে আসব তখন ওরা যত খুশী আমার পেছন দেখুক, আমি তো আর তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি না!'

গালে হাত বোলালো নীল। খড়খড়ে দাড়িতে বিরক্ত হল। কত বয়স হল? বত্রিশ! বত্রিশ বছর বয়সটা এমন কিছু নয়। কিন্তু তবু নিজেকে কেমন হতচ্ছাড়া বলে মনে হয় আজকাল। সে আয়নায় নিজের চিবুক দেখল। অদ্ভুত সুন্দর একটা ভাঁজ ছিল তার চিবুকে। ভাঁজটা এমনি একটু গভীর কিন্তু সুন্দর ভাবতে বাধল তার। ঝরনা নদী হলেও তার প্রাণ মরে না কিন্তু নদী যদি খাল হয়ে যায় তা হলে যে দশা হবে এই চিবুকের এখনকার ভাঁজটা ঠিক তাই হয়েছে। একটা আঙুল বোলালো সে ভাঁজের ওপরে। এইখানে আঙুল রেখে অনেককাল আগে একজন বলেছিল, 'তোমার দিকে তাকিয়ে আমি যে একটুও রাগতে পারি না।'

বোম্বে মেলের থ্রিটিয়ার কামরার ছোট্ট টয়লেটের ভেতর দাঁড়িয়ে হঠাৎ নীলের মনে হল তার জীবনটাও এইরকম। চারপাশে আঁট হয়ে আসা দেওয়াল। মাথার ওপর চোখ ধাঁধানো আলো। আর তীব্র গতিতে সে এ সব নিয়ে ছুটে চলেছে। তফাৎ হল এই ট্রেন থেমে যাবে হাওড়ায় গিয়ে, তার থামার স্টেশনটাই জানা নেই। পকেটে হাত ঢোকাল নীল। সেই সন্ধ্যেবেলায় ঘটনটা ঘটার পর এই প্রথম বোতলটাকে বের করল। এই ছোট্ট দরজা বন্ধ টয়লেটে কোন দর্শক নেই। সন্ধ্যেবেলায় লোকটাকে সে বলেছিল, 'আমি জীবনে কখনও মাতাল হইনি। মদ খেয়ে কারো সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার বদলে বেশী রকমের ভদ্রলোক হয়ে যাই।'

'আপনি কি হন আমাদের জানার দরকার নেই। এটা পাবলিক প্লেস, মহিলারাও আছেন, এখানে আপনি মদ খেতে পারেন না। আমরা খেতে দেব না।' লোকটা দৃঢ় গলায় বলতেই অনেকে ওকে সমর্থন করল। শেষপর্যন্ত বোতলের মুখটা না খুলে সবাইকে দেখিয়ে সে সামনে রেখে দিল ওটাকে। প্রকাশ্যে মদের বোতল দেখতে ওদের খুব ভাল লাগছিল না কিন্তু যেহেতু সে মদ খাচ্ছে না তাই কারোর কিছু বলার ছিল না। ব্যাপারটা চাউর হয়ে গেল আশেপাশে। কয়েকজন উৎসাহী যুবক এগিয়ে বোতলটাকে দেখল। একজন হিন্দীতে বলল, 'যে যে জাতের যা নিয়ম তা তাদের মানতে দেওয়া উচিত। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা ঠিক আমাদের মত নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নীলের। সে গলা তুলে বলেছিল, 'আপনি খুব বেশী জেনে গিয়েছেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে এখন কিছু নেই। সবাই ভারতবর্ষের নাগরিক। আর আপনি যদি মজা দেখার জন্যে এখানে এসে থাকেন, তাহলে শুনুন, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলতে যাঁদের বোঝাচ্ছেন তাঁরাও শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাঁদেরও নিজস্ব রুচিবোধ আছে। এবং আমি একদম একশভাগ বাঙালি।' বোতলটাকে সে তুলে রেখেছিল এর পরে।

এখন মুখটা খুলে সামান্য গলায় ঢালল সে। এটা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। রাত নামলেই শরীরে একটা ঝিমঝিমানি আকাঙ্ক্ষা ঝরে। দুই কি তিনবার। ব্যাস। মনে মনে জানে এটাকেই নেশা বলে কিন্তু যে নেশা তার মস্তিষ্ককে আক্রমণ করছে না, শরীরকে অশক্ত করার পর্যায়ে যাচ্ছে না সেই নেশাতে তার আপত্তি নেই। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শব্দ দুটো সারাজীবন তার ওপর সেঁটে রয়েছে। যখন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছে তখনও কোন কোন

ভারতীয় তাকে দেখে শব্দদুটো বলেছে, হ্যাঁ, তার গায়ের চামড়া প্রায় সাহেবদের মত, চুল কালো কিন্তু চোখের রঙ কটা। তার চেহারায় একটা আপাত রুক্ষতা আছে। চমৎকার ইংরেজি বলতে পারে সে। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে সে ভারতীয়দের কাছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হয়ে যাবে? আর এই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শব্দদুটো স্বাধীনতার পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও কি করে লালিত হয় সেটাই বিস্ময়ের। ভারতবর্ষের অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সানফ্রান্সিসকো বন্দরে পুলিশ তার চোখের সামনে একজন হরেকৃষ্ণয়ালাকে ধরেছিল। ধর্মসংক্রান্ত প্রচারপত্র বিলি করছিল লোকটা। বন্দরের ওই এলাকায় ব্যাপারটা নিষিদ্ধ ছিল। পুলিশ তাকে ধরে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কি আমেরিকান সিটিজেন?' লোকটা মাথা নেড়েছিল। 'কোন্ দেশের লোক তুমি?' পুলিশের প্রশ্নের জবাবে লোকটা বিড়বিড় করছিল, 'আমি বাঙালী। কলকাতা থেকে এসেছি।'

পুলিশটা খুব অবাক হয়, 'কলকাতা? ওটা কি একটা দেশ?'

লোকটা বুঝতে পারে, 'না। কলকাতা হল ওয়েস্ট বেঙ্গলে।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'ইন্ডিয়ায়।'

'তাই বলো, তুমি ইন্ডিয়ান। এ কথাটা প্রথমেই বলতে পারোনি?'

কথাটা সত্যিই ভারতীয়দের মুখে চট করে আসে না। জাহাজেও শুনেছে নীল, এ গুজরাতি, ও মহারাষ্ট্রিয়ান, ও বিহারী কিন্তু কেউ ভারতীয় নয়। সেক্ষেত্রে একজন মানুষ যার চেহারার সঙ্গে বিদেশিদের মিল আছে তাকে চট করে ভারতীয় বলে মনে করতে কষ্ট হবে বইকি। অথচ নিজের পাশপোর্টের দিকে তাকালে সবাইকে পড়তে হবে, ন্যাশনালিটি—ইন্ডিয়ান। মদটা তিনবারে যতটা গেল ততটাই যথেষ্ট। বোতলের মুখ বন্ধ করে সেটাকে পকেটে চালান করে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল সে। ঘুমন্ত কামরার করিডোর দিয়ে টলতে টলতে আসার সময় সে হেসে ফেলল। ট্রেনের গতিতে পায়ের তলার মেঝে এখন টলছে বলেই শরীর স্থির থাকছে না। অথচ কেউ যদি জানে সে এইমাত্র মদ খেয়ে এল অমনি তাকে মাতাল ভেবে বসবে।

ওপরের বাঙ্কে শুয়ে এবার ঘুম আসছিল তার। ট্রেনের দুলুনি, মদের প্রতিক্রিয়া সেই ঘুমকে আসতে সাহায্য করছিল। অনেক অনেক বছর পরে কলকাতায় যাচ্ছে সে। ঠিক দশ বছর হয়ে গেল। বাইশ বছর বয়সে কলকাতা

ছেড়েছিল জাহাজের খালাসী হয়ে। এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজ। একটু একটু করে মাইনে বাড়ল। ভারতীয় জাহাজে কাজ করার সময় বিদেশে গেলে প্রায় ভিখারির মত থাকতে হত। ডলার পাউন্ডের দেখা নেই, ভারতীয় টাকা সেসব দেশে সাদা কাগজের চেয়েও কম দামী। এই সময় একদিন বার্গেনে ডিসুজার সঙ্গে আলাপ। ওই উদ্যোগী হয়ে নিয়ে গেল বিদেশী জাহাজে। ইন্টারভিউ দিয়ে খুশী করায় কাজ পেয়ে গেল নীল। তখন মাইনে হত ডলারে। এক ডলারের দাম ছিল ভারতীয় টাকায় দশ টাকা। মাত্র আট বছর আগের ঘটনা। এখন সেটা পেঁাছেছে ছাব্বিশ সাতাশে। বোম্বেতে খোলা বাজারে বত্রিশ। ভাবা যায়?

কিন্তু এই জলে জলে ঘোরা, মাঝে কয়েকদিনের জন্যে বন্দরে নামা, এ আর ভাল লাগছে না তার। বন্দরে নামলে আগে দল বেঁধে যেত পাড়ে, বারে অথবা শহর দেখতে। ডিসুজা ছবি তুলত মেয়েদের। ভদ্র মেয়েদের। অনুমতি নিয়েই তুলত। তারপর জাহাজ ছাড়ার আগে যেত রেডলাইট এরিয়ায়। অদ্ভুত লোক অনেক দেখেছে সে কিন্তু ডিসুজার মত বোধহয় কাউকে দ্যাখেনি। ডলার খরচ করে মেয়েদের ঘরে ঢুকে তার ছবি তুলত। শুধু ছবি, তার বেশী কিছু নয়। পাঁচ মহাদেশের পাঁচটা অ্যালবামের নিচে আর একটা অ্যালবাম লুকিয়ে রাখত সে। কাউকে দেখাতে চাইত না চট করে। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে ডিসুজা তাকে অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে দিয়েছিল। তখন পর্যন্ত পৃথিবীর পঁচিশটা দেশের বারবনিতার ছবি সাঁটা হয়েছিল সেখানে। ডিসুজা হেসে বলেছিল, 'জল দেখতে সব দেশেই প্রায় একরকমের কিন্তু পান করলে বোঝা যায় স্বাদ সমান নয়।'

এখন জাহাজগুলোয় আধুনিকীকরণের হাওয়া লেগেছে। আর আধুনিকী-করণের প্রথম পদক্ষেপ ব্যয়সঙ্কোচন। একসময় ডেক পরিষ্কার করার জন্যে স্থায়ী লোক রাখা হত। তারপর তাদের সরিয়ে দিয়ে বন্দরে থাকার সময় ঠিকে লোক দিয়ে জাহাজ ধোওয়ানো হত। বন্দর ছাড়লে তাদেরও কাজ শেষ। এখন ধোলাইবাহিনীর বদলে যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। একটার পর একটা ধাপে মানুষের কাজ যন্ত্র দিয়ে করিয়ে কোম্পানি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে ভারমুক্ত হচ্ছে। এখন কম্প্যুটার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, এমন একটা সময়ের বেশী দেরি নেই যখন গোটা জাহাজ চালাতে চারজনের বেশী মানুষের প্রয়োজন হবে না। নীল জানে তার ওপরেও কোপ আসছে। এতদিন এক নাগাড়ে চাকরি

করেও কিছুই জমায়নি সে। জমাতে ইচ্ছেও করত না। মদ সিগারেট জামা-প্যান্ট আর বন্দরে মাইনের টাকা উড়িয়ে দিয়ে চমৎকার ছিল সে। বেশির ভাগ নাবিক বছরে তিন চার মাসের জন্যে বসে যায়। বাড়ির মানুষের সান্নিধ্য তাদের অক্সিজেন দেয়। নীল বসেনি কখনও। কোম্পানির একটা না একটা জাহাজ সবসময় সমুদ্রে বের হচ্ছে। কাজ পেতে অসুবিধে হত না তাই। এবার বোম্বে পোর্টে পৌঁছনো মাত্র জাহাজ আটকে গেল। বন্দর ধর্মঘট চলছে। শ্রমিক ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে বিপুল প্রতিবাদ। প্রতিবাদ তাদের কোম্পানির বিরুদ্ধেও। যতদিন ওই অচলাবস্থার অবসান না হচ্ছে ততদিন কিছু করার নেই। দুদিন হোটেলে বসে থেকে নীলের মনে হল এ ভাবে চললে তাকে না খেয়ে মরতে হবে। সঞ্চয় যা আছে তাতে বড়জোর মাস দেড়েক চলবে। আর তখনই তাকে কলকাতা টানতে লাগল। অনেকদিন ধরে যে ক্ষতটা তাকে অস্থির করত, সময় যার ওপর একটু একটু করে আড়াল ফেলেছিল আজ হঠাৎ যেন একটানে তা সরে গেল। চোখ বন্ধ করলেই মনে সেই মুখ ভাসে যে বলেছিল, 'তোমার দিকে তাকিয়ে আমি যে একটুও রাগতে পারি না।' দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল নীলের বুক উপড়ে। ছুটন্ত বোম্বে মেলে তখন শুধুই ঘুম, গভীর ঘুম, চাকায় লাইনে যে তীব্র প্রতিবাদের শব্দ তাও সেই ঘুম ভাঙাতে পারছিল না।

এর মধ্যেই তিনঘণ্টা পিছিয়ে পড়েছে ট্রেনটা। বিহার যখন ছাড়াচ্ছে তখনই আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ, রোদ্দুর নেই। দীর্ঘ যাত্রায় যে ক্লান্তি আসে সেটুকুই, হঠাৎ কানে এল, 'তোমার হাতে ওটা কিসের ছবি ?'

চমকে তাকাল নীল। একটি চার পাঁচ বছরের শিশু। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই একে দেখেছে সে। ওপাশের সিটে বসা মহিলাই এর মা। মহিলাকে দেখলে মনে হয় এখনও মা হবার মন তার হয়নি। রঙিন শালোয়ার কামিজে, চুল আঁচড়ানোর কায়দায় তিনি এখনও কলেজের ছাত্রী সাজতে পারেন! বাচ্চাটার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল নীল। চোখ তুলে দেখল মহিলা এ দিকেই তাকিয়ে আছেন, 'দিল, ওঁকে বিরক্ত করো না।'

বাচ্চাটা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি তোমাকে বিরক্ত করছি ?'

'একটুও না।'

'আমি কারো সঙ্গে কথা বললেই মা বলে বিরক্ত করো না। এটা কি ছবি ?' বাচ্চাটা তার কচি আঙুল রাখল নীলপরীর গায়ে।

নীল বলল, 'জলপরী।'

'জলে থাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি হাতে রেখেছ কেন ? জলে ছেড়ে দাও।'

নীল হেসে ফেলল, 'একবার হাতে আঁকা হয়ে গেলে আর জলে ছাড়া যায় না।'

'আর কারো হাতে আঁকা নেই, তোমার হাতে কেন আছে ?'

'আমি তো সমুদ্রে থাকতাম, তাই।'

'সমুদ্রে থাকলেই বুঝি হাতে জলপরী আঁকতে হয়। তুমি এঁকেছ ?'

'না। অন্যলোক এঁকে দিয়েছে।'

'কষ্ট হয়নি ? ঘষলেও যে উঠছে না!'

'একটু হয়েছিল।'

এইসময় মহিলা আবার ডাকলেন, 'দিল, এদিকে এস।'

নীল মুখ ফেরাল, 'ও কিন্তু আমাকে বিরক্ত করছে না!'

মহিলা বললেন, 'না থামালে সমানে বকবক করে যাবে।'

'আমার ভাল লাগছে। অনেক বছর পরে বাংলায় বাচ্চার সঙ্গে কথা বলছি।'

আশেপাশের যাত্রীরা এতক্ষণ চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল নিস্পৃহ চোখে। যে ভদ্রলোক মদ খাওয়ার ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'বোম্বেতে কম বাঙালী নেই?'

নীল বলল, 'আমি সমুদ্রে থাকতাম। জাহাজে চাকরি করি।'

আর একজন বলল, 'তাই বলুন। আমার একটু যে সন্দেহ হচ্ছিল না তা নয়? এখনও নাবিকের চাকরি খুব অ্যাডভেঞ্চারাস, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তিমি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ একটার পর একটা আজগুবি প্রশ্ন শুরু হয়ে গেল। সমুদ্র সম্পর্কে যত কৌতূহল মানুষের মনে চাপা থাকে তা যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে লাগল। বেশ ধৈর্য ধরে তাদের জবাব দেবার চেষ্টা করল নীল। এইসময় প্রথম লোকটি বলল, 'দোষ আপনার। তখন যদি বলতেন আপনি নাবিক তা হলে ঝামেলাই হত না।'

এত লোককে কথা বলতে দেখে বাচ্চাটা ফিরে গিয়েছিল মায়ের কাছে। ভদ্রমহিলা একা ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছেন। হয়তো স্বামীর কর্মস্থল থেকে পিত্রালয়ে। পৃথিবীর মানুষের অধিকাংশই যে যার ব্যবস্থানুযায়ী সুখের পরিধিতেই বসবাস করে।

হাওড়ায় পৌঁছবার ঢের আগেই প্রায় একসঙ্গে অন্ধকার এবং বৃষ্টি নামল। সেইসঙ্গে ঝড়। ট্রেনের জানলাগুলো বন্ধ করে সোঁ সোঁ শব্দ শোনা ছাড়া কিছু করার ছিল না। গাড়ির গতি কমছে। রাত সাড়ে সাতটায় অজস্র সিটি বাজিয়ে ট্রেনটা যখন হাওড়া স্টেশনে ঢুকল তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে। প্ল্যাটফর্মে নেমেই জানা গেল কলকাতা শহর জলের তলায়। হাওড়া স্টেশনে যে সব থাকার জায়গা আছে সেগুলো দখল হয়ে গেছে। রেস্টুরেন্টে ভিড় উপচে পড়ছে। বাইরের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে ট্যাক্সি নেই, এমন কি বেশী পয়সার প্রাইভেট

গাড়িগুলোকেও দেখা যাচ্ছে না। কলকাতায় আজ বৃষ্টি নেমেছে দুপুর থেকে।

গিজগিজে ভিড়ে দাঁড়িয়ে রুমালে মুখ মুছল নীল। কি করে এই অবস্থায় ইলিয়ট রোডে পৌঁছানো যায়! কলকাতায় কারও বাড়িতে সরাসরি ওঠার সম্পর্ক এখন আর নেই। ইলিয়ট রোডে টেডিলালের একটা হোটেল আছে। জন্মাবধি সে হোটেলটাকে দেখে আসছে। বারো বছর আগেও দৈনিক কুড়ি টাকায় থাকা যেত সেখানে। টেডিলালের বয়স হয়েছে কিন্তু লোকটা ছিল বেশ হাসিখুশী। এমন হতে পারে গিয়ে দেখবে টেডিলাল মরে গেছে, তার হোটেলও নেই। তবু প্রথমে ওর সন্ধানে যাওয়া দরকার। চেনাজানা অনেক মানুষের খবর রাখে টেডিলাল।

রাত বাড়ছে অথচ বৃষ্টি বন্ধ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এলোমেলো পায়ে স্টেশন চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে ও একটার পর একটা ট্রেন বন্ধ হবার ঘোষণা শুনতে পাচ্ছিল। হঠাৎ সেই বাচ্চাটাকে দেখতে পেল সে। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে মানুষজন দেখছে। এরাও নিশ্চয়ই যেতে পারছে না স্টেশন ছেড়ে। সে একটু এগিয়ে যেতেই মহিলা দেখতে পেলেন এবং মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। বাচ্চাটা হেসে ফেলল, 'বাড়ি যাবে না ?'

নীল বলল, 'কি করে যাব ! গাড়ি চলছে না যে। তোমাকে কেউ নিতে আসেনি ?'

এবার মহিলা মুখ ফেরালেন, 'কি সমস্যা বলুন তো ! চিঠি দিয়েছি, টেলিগ্রাম করেছি তবু কারো দেখা নেই। শুনছি শহর নাকি জলের তলায় ডুবে আছে।'

বাচ্চাটা বলল, 'তোমার জলপরীকে বল না আমাদের নিয়ে যেতে !'

নীল হেসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল, 'দেখুন, হয়তো বৃষ্টির জন্যেই আসতে পারছে না। টেলিফোন থাকলে চেষ্টা করুন না !'

'পাশের বাড়িতে আছে। এখানকার পাবলিক বুথটা কোথায় ?'

খানিক আগে নোটিস বোর্ডটা চোখে পড়েছিল নীলের। ভদ্রমহিলার সঙ্গে মালপত্র বলতে একটাই সুটকেস আর হাতব্যাগ। নীল চাইলেও তিনি নিজেই বয়ে নিয়ে গেলেন টেলিফোন বুথের সামনে। সেখানে বেজায় ভিড়। যারা ভেতরে ঢুকছে তারা নাকি লাইন পাচ্ছে না। ভদ্রমহিলা বললেন, "বাব্বা, আমার পক্ষে এদের সঙ্গে মারপিট করে টেলিফোন করা অসম্ভব ব্যাপার।'

নীল বলল, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমাকে নাম্বারটা দিতে পারেন, লাইন পেলে আপনি কথা বলবেন।'

ভদ্রমহিলা খুশী হলেন বোঝা গেল। চটপট ব্যাগ খুলে একটা কাগজে নাম্বারটা লিখে নীলের দিকে এগিয়ে ধরলেন। নীল দেখল ওটা থিন সেভেন এক্সচেঞ্জ।

মিনিট দশেক সময় লাগল একটা টেলিফোনের দখল পেতে। ডায়াল করল সে কাগজটাকে সামনে রেখে। শেষ নাম্বার ঘোরার আগেই এনগেজড্ টোন। দ্বিতীয়বারেও একদশা। পেছনে দাঁড়ানো একজন বলে উঠল, 'এনগেজড্ হলে হাজারবার ঘোরালেও লাইন পাবেন না। বৃষ্টির জল ঢুকে গেছে।'

নীল জবাব দিল না। ভিড়ের মাথা টপকে দেখল মহিলা বাচ্চাটার হাত ধরে তার দিকে সঙ্কেতের অপেক্ষায় তাকিয়ে আছেন। সে আবার নম্বর ঘোরাল। এবার সেই আওয়াজ নেই। রিঙ্ হচ্ছে। হঠাৎ রিঙ্-এর আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যেতেই সে পয়সা ফেলল গর্তে। সঙ্গে সঙ্গে একটি নারীকণ্ঠ কথা বলে উঠল, 'তুমি আমাকে কোন অজুহাত দিও না। আমি এ সব শুনতে চাই না। বৃষ্টি হোক বন্যা হোক তুমি ওটা পেঁছে দিয়ে যাও। আর এক ঘণ্টা সময় দিলাম তোমাকে।'

তৎক্ষণাৎ একটি পুরুষকণ্ঠ বিব্রত স্বরে বলে উঠল, 'আশ্চর্য ! আমি পেঁছাবো কি করে ? ট্যাক্সি নেই, রিক্সাও চলছে না। ওটা আমার সঙ্গে আছে।'

'তুমি কোত্থেকে কথা বলছ ?' নারীকণ্ঠে বেশ হুকুম করার অভ্যেস আছে।

'পার্ক স্ট্রীটের ড্রিমল্যান্ড রেস্টুরেন্টের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি।'

'মদ গিলেছ ?'

'না।'

'ঠিক আছে। যতক্ষণ আমার লোক তোমার কাছে না পেঁছাচ্ছে ততক্ষণ তুমি নড়বে না। কি শার্ট পরেছ ?'

'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট চেক।'

'ও-কে। প্যাকেটটা কোলে নিয়ে বসে থাকো। আমার লোক কালেক্ট করছে !'

'তাকে আমি চিনি ?'

'না। সাদা রুমাল হাতে ঝুলিয়ে ঢুকবে। বাই।' লাইনটা কেটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে উত্তেজিত গলা ভেসে এল, 'দাদা, হয় কথা বলুন নয় ফোন ছাড়ুন। আর কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন ?'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল নীল বুথ থেকে। কানের পর্দায় সেই নারীকণ্ঠের পুরুষালী হুকুমের স্বর এখনও গমগম করছে। এবং তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা তার কাছে অন্যরকম চেহারা নিয়ে নিল। কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের ড্রিমল্যান্ড রেস্টুরেন্টে একটি সাদাকালো চেক সার্ট পরা লোক কিছু নিয়ে বসে আছে যেটা অত্যন্ত জরুরী। জরুরী না বলে দামী বলাই ভাল নইলে তার মালিকানা পাওয়ার জন্যে এমন ঝড়জলের রাত্রে কেউ লোক পাঠায় না। কিন্তু জিনিসটা কি এবং কতটা দামী? কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা আইনসম্মত নয়। নীল হেসে ফেলল। বেআইনি দামী জিনিষের অধিকার পেলে কেমন হয়? চমৎকার হয়। যেকদিন কলকাতায় থাকতে হবে সে-কদিন কোন চিন্তাভাবনা থাকবে না। শুধু একটা সাদা রুমাল হাতে ঝুলিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢোকা—, ব্যাস।

'মা জিজ্ঞাসা করছে লাইন পেয়েছ?'

নীল বাস্তবে ফিরে এল। বাচ্চার আঙুল ধরে বলল, 'নাঃ। সব লাইন খারাপ।'

'তুমি অতক্ষণ কি কথা বলছিলে?'

'কই? আমি তো কথা বলিনি।'

'তাহলে চুপচাপ কানে ফোন চেপে শুনে যাচ্ছিলে?'

নীল হেসে ফেলল। তারপর বাচ্চাটাকে ওর মায়ের কাছে নিয়ে এল। ভদ্রমহিলা যেনঃহঠাৎ জড়সড় হয়ে গেছেন। বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

'লাইন পাইনি।'

'সত্যি বলছেন?'

'হাঁ। মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

'না। আপনি রিসিভার কানে চেপে কিছু শুনছিলেন মনে হল, তাই!'

'আপনার কথা হলে তো ডেকে দিতাম।'

'জানি না। হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না।' মহিলা বাচ্চাটাকে কাছে টানলেন, 'ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ।'

নীল বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মনে হচ্ছে আপনি কোন সমস্যায় আছেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় সমস্যা হল আজকের রাত্রে আপনার ছেলেকে নিয়ে ভাল আশ্রয়ে যাওয়া। আপনি সোজা স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করুন,

উনি হয়তো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।'

'স্টেশন মাস্টার ?' ভদ্রমহিলা কূল পাচ্ছিলেন না।

'হ্যাঁ। সাধারণত মানুষ ওদের অ্যাপ্রোচ করে না। দেখুন না। আমার খুব তাড়া আছে, নইলে—, আচ্ছা এলাম।' নিজের ব্যাগ তুলে নিয়ে নীল হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল। তার ভয় করছিল আর কিছুক্ষণ এদের সঙ্গে কাটালে সে নির্ঘাৎ জড়িয়ে পড়বে।

ইলিয়ট রোডে যাওয়া যেখানে অসম্ভব ব্যাপার সেখানে পার্ক স্ট্রীটে কি ভাবে যাবে তাই ভেবে পেল না নীল। বৃষ্টি পড়ছে এখনও, তবে খুব জোরে নয়। জলেভেজা স্টেশনের বাইরেটা চকচক করছে। এইসময় একটা লোক এগিয়ে এল, 'কোথায় যাবেন স্যার ?'

'কিভাবে নিয়ে যাবে ?' নীল সরাসরি প্রশ্ন করল।

'এখন তো সব বন্ধ। আমি কয়েকজনকে আউটরাম ঘাটে পৌঁছে দিতে পারি।'

'কিভাবে ?'

'নৌকোয়। এখন ঝড় নেই তাই মনে হয় অসুবিধে হবে না।'

'বৃষ্টি ?'

'আমার নৌকোয় ছই আছে। মাথা পিছু পঞ্চাশ পড়বে।'

'ওখান থেকে ?'

'তা আমি জানি না স্যার।'

একটু ভেবে রাজী হয়ে গেল নীল। লোকটার পেছনে ব্যাগ কাঁধে দৌড়াতে দৌড়াতে সে খেয়াঘাটে পৌঁছে দেখল একটা মাঝারি সাইজের নৌকোর ছই-এর তলায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন ঢুকে বসে আছে। দৌড়ানো সত্ত্বেও শার্ট এবং মাথা ভিজে গিয়েছিল তার। ছই-এর তলায় ঢুকে রুমাল বের করে জল মোছার চেষ্টা করল।

রাত বেশী নয়। কিন্তু গঙ্গার বুকে এখনই ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। মাঝি নৌকো ছাড়ল। জলের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা শব্দ তুলছে। জনা আটেক মানুষ পরস্পরের শরীরের সঙ্গে মিশে আছে অথচ কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না।

আউটরামে পৌঁছে টাকা দিয়ে পাড়ে উঠে দেখা গেল বৃষ্টি এখানে ইলশে-গুঁড়ি। বিশাল রাজপথ ভিজে চকচক করছে। কোন ট্যাক্সি নেই, বাস্ দূরের

কথা। কোন লাভ হল না। মনে মনে বিড় বিড় করল নীল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সেই ব্যাগটা হাত বদল হয়ে গেছে। কিন্তু ইলিয়ট রোড যেতে গেলে তো পার্ক স্ট্রীট দিয়েই ঢুকতে হবে। আর পার্ক স্ট্রীট এখান থেকে হাঁটলে মিনিট পঁচিশেক দূরে।

কিন্তু হাঁটতে হল না। স্বয়ং ঈশ্বর এসে হাজির হয়েছেন এমন ভঙ্গীতে একটা টেম্পো এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করল, 'পার্ক সার্কাস যানা হ্যায় ?'

নৌকোয় আসা জনা চারেকের সঙ্গে নীল ও বাকিরা উঠে পড়ল। তার পাশে দাঁড়ানো লোকটা বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে সাদা রুমাল বেঁধেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যাওয়ায় সে ছুটন্ত টেম্পোয় দাঁড়িয়ে লোকটিকে বলল, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি ?'

নীল গম্ভীর গলায় বলল, 'এখনই একটা সাদা রুমাল দরকার আমার, আপনারটা দেবেন ?'

'সাদা রুমাল ?' লোকটা এমন অনুরোধ কল্পনাও করেনি।

'দাম দিতে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। আপনি আমার রঙিন রুমালটা নিতে পারেন।'

'আমি আপনার ব্যবহার করা রুমাল নেব কেন ?'

'ঠিক কথা। কিন্তু যেহেতু আমার সাদা রুমালের খুব প্রয়োজন তাই বাধ্য হয়েই—।'

লোকটা কেমন অদ্ভুত চোখে নীলকে দেখল। নীল বুঝতে পারল তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে লোকটার মনে সন্দেহ এসেছে। কিন্তু লোকটাকে রুমালটা খুলতে দেখল সে। প্রায় ভিজে যাওয়া রুমাল নীলের হাতে তুলে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' রুমালটা থেকে জল চিপে বের করে ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে নিল নীল। পার্ক স্ট্রীট এগিয়ে আসছে। কিন্তু মোড়ের ওপর পৌঁছেই টেম্পো থেমে গেল। ড্রাইভার মুখ বের করে বলল, 'এক হাঁটু জল সামনে, আমি ডান দিক দিয়ে ঘুরে যাব।'

অতএব নীল নেমে পড়ল। পাঁচটা টাকা দক্ষিণা দিয়ে সে পার্ক স্ট্রীটে ঢুকল। খানিকটা এগোতেই ফুটপাতের ওপর জল দেখতে পেয়ে প্যাণ্ট গোটালো সে। জুতো খুলে খালি হাতটায় নিল। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়েই

চলেছে। জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে সে পার্ক হোটেলের তলা দিয়ে হেঁটে এল। সেই সব কাগজের স্টলগুলো এখন উধাও। পার্ক স্ট্রীটে একটা জিপ অনেক ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেল। শীত শীত করছিল নীলের। বার রেস্টুরেন্টগুলোর নিওন সাইনগুলো যেন হঠাৎই আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শেষপর্যন্ত সে ড্রিমল্যান্ড রেস্টুরেন্ট কাম বারের সামনে এসে দাঁড়াল। ফুটপাতে জল বলেই বোধহয় ডোরকিপার বাইরে নেই। এক ধাপ উঠে জুতো পায়ে গলিয়ে নিয়ে সে দরজা ঠেলল।

যেভাবে বিদেশি বাজনা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাতে কে বলবে—বাইরে, এক পা দূরেই কলকাতা ভেসে যাচ্ছে। আধা আলো আধা অন্ধকারে এই আব-হাওয়াতেও কিছু মানুষ বসে আছে এই টেবিল সেই টেবিলে। দুজন মহিলাকেও দেখা গেল। একটি মেয়ে শরীর দুলিয়ে হিন্দী গান শুরু করল ডায়াসে। সুটকেসটাকে মাটিতে রেখে নিজের চুল ঠিক করে নিল নীল।

'আপনি একদম ভিজে গিয়েছেন স্যার।' একজন বেয়ারা এগিয়ে এল।

'কি আর করা যাবে!' নীল পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করল।

'যে কোন টেবিলেই বসতে পারেন। সবই তো খালি।'

দরজার কাছাকাছি টেবিলের চেয়ারটাই বেছে নিল সে। সাদা কালো চেক শার্ট কোথায়? চট করে সে কাউকে দেখতে পেল না। পকেটের চ্যাপ্টা বোতলে মদ থাকা সত্ত্বেও এক পাত্র বলতে হল তাকে। আর এইসময়েই দেখতে পেল কোণের টেবিলে একটি মানুষ বসে আছে যার গায়ে কালোসাদা চেক শার্ট। হঠাৎই সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। না, তার আগে কেউ এখানে আসেনি ওই ব্যাগটার দখল নিতে। নীল, এখন তোমার সামনে দুটো পথ খোলা। হয় এখান থেকে মাল খেয়ে চুপচাপ কেটে পড় নয় রুমাল দেখিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে যাও। ওর ব্যাগে যদি মূল্যবান কিছু থাকে তাহলে—। রুমালে মুখ মুছতে গিয়ে সে থমকে গেল। অন্যের ব্যবহার করা রুমালে মুখ মুছতে ঘেন্না হল তার। কিন্তু দ্বিতীয় রুমালটা বের করতে তার দ্বিধা হল। ডায়াসে গায়িকা এখন চটুল হিন্দী গান গাইছে দুলে। বেয়ারা গ্লাস দিয়ে যাওয়ামাত্র দরজাটা খুলে গেল। একটা লোক একদম ভিজে কাক হয়ে ভেতরে ঢুকতেই বেয়ারাগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লোকটার শরীর থেকে জল পড়ে কার্পেট ভিজিয়ে দিচ্ছে। বেয়ারাদের প্রতিবাদ লোকটা গ্রাহ্য করল না. 'বাইরেটা সমুদ্র করে রেখেছ, ভেসে আসতে হলে এর চেয়ে কম জল পড়বে না। তোমাদের

বার বন্ধ থাকলে আমার চেয়ে কেউ বেশী খুশী হত না।' লোকটা পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে অকারণে শূন্যে দুবার ঝেড়ে মাথার চুল মুছতে লাগল। তারপর সময় নিয়ে চুরুট ধরাল।

নীল বুঝে গেল এই সেই লোক। স্বাস্থ্য ভাল, ব্যায়াম করা চেহারা, কিন্তু বেশ খাটো। কিন্তু লোকটা এসেছে মরীয়া হয়ে। জুতো মোজা প্যান্ট সব ভিজে গেছে ওর। ইতিমধ্যেই কোণের সাদাকালো চেক শার্টকে দেখে নিয়েছে লোকটা। তারপর গম্ভীর ভঙ্গীতে সেদিকে এগিয়ে গেল।

নীলের সমস্ত উৎসাহ যেন একেবারে তলিয়ে গেল। সেই মহিলার লোক তার পরে এসেও আগে ব্যাগটাকে চোখের ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে। সে যদি এখানে ঢুকেই ওই লোকটার কাছে এগিয়ে যেত! নীল দেখল আগন্তুক চেক শার্টের উল্টোদিকে গিয়ে বসেছে হাতে সাদা রুমাল ধরে। কিন্তু আশ্চর্য; ওরা কেউ কথা বলছে না। চেক শার্টের মুখটায় বেশ অস্বস্তি। ঘার ঘুরিয়ে লোকটা কি তাকে দেখার চেষ্টা করছে? হঠাৎই নীলের মনে হল লোকটা সমস্যায় পড়েছে। দরজা পেরিয়ে এখানে ঢুকে সে যখন সাদা রুমাল বের করেছিল তখন নিশ্চয়ই লোকটা তাকে দেখেছিল। এখন দ্বিতীয় আর একজনের হাতে সাদা রুমাল দেখে সম্ভবত ফাঁপরে পড়েছে।

হঠাৎ সাদাকালো চেক সার্টকে একটা এ্যাটাচি হাতে টেবিল ছেড়ে উঠতে দেখল নীল। ওর সামনে গিয়ে বসা লোকটা বেশ হতভম্ব। সাদাকালো চেক শার্ট সোজা চলে এল বার কাউন্টারে, 'আর একটা টেলিফোন করতে পারি?'

'একটু আগে ডেড হয়ে গেল স্যার।' কাউন্টারের লোকটি জানাল।

'ডেড হয়ে গেল? কিছুক্ষণ আগে আমি ফোন করেছিলাম।'

'জানি স্যার। একটু আগেই হল। চেষ্টা করুন।'

সাদাকালো চেক শার্ট কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস নিয়েই রিসিভার তুলল। বার চারেক বোতাম টিপে হতাশ হল। তারপর এদিকে তাকাল। চোখাচোখি হতেই নীল সাদা রুমালটা বের করে সিগারেট ঠোঁটে চাপল। তারপর দেশলাই-এর জন্যে কপট খোঁজাখুঁজি করে উঠে এল টেবিল ছেড়ে, 'এক্সকিউজ মি, আপনার কাছে দেশলাই আছে?'

'সরি। আমি স্মোক করে না।' সাদাকালো চেক শার্ট বিড়বিড় করল।

'যা বৃষ্টি। ম্যাডাম না বললে কোন্ শালা এখানে আসত!' নীল বলল।

'ম্যাডাম?'

'আপনাকে কেউ ফোনে জিজ্ঞাসা করেছিল মদ গিলেছেন কি না?'

'হ্যাঁ, মানে-- ।'

'দেখুন, প্রত্যেকের নিজস্ব অধিকার আছে সে কি করবে। কিন্তু ওঁর স্বভাব হল একটু ধমকের সঙ্গে কথা বলা। আপনি তো জানেনই।'

'কিন্তু আমি মদ খাইনি।' লোকটা প্রতিবাদ করল।

'খেলেও কারও কিছু বলার নেই যতক্ষণ না আপনার মস্তিষ্ক ঠিক থাকছে? তবে আমার মনে হয় আপনি একটা ভুল করেছেন।' নীল হাসল।

'ভুল? কি ভুল?'

'ম্যাডাম আপনাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্যাগটাকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে।'

'কতক্ষণ বসে থাকব? দেখতেও তো খারাপ লাগে।'

'তা ঠিক। দেরি দেখে ম্যাডামকে ফোন করতে চাইছিলেন?'

'তা নয়। আসলে আমার টেবিলে গিয়ে ওই লোকটা যেভাবে সাদা রুমাল নাচাচ্ছে তাতে একটু ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম। আপনি যখন ঢুকেছিলেন তখনই আপনার হাতে সাদা রুমাল দেখেছি আমি।' সাদাকালো চেক শার্টকে বেশ সরল ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখা গেল।

নীল বলল, 'আপনার প্রব্লেম আমি বুঝতে পারছি। লোকটার হাতে সাদা রুমাল আমিও দেখেছি। ম্যাডাম একসঙ্গে দুজন লোককে ব্যাগ কালেক্ট করতে পাঠাতে পারেন না।'

হঠাৎ সাদাকালো চেকসার্ট বলল, 'কিন্তু এখন আমার আর সন্দেহ নেই।'

'কি রকম?'

'আমি যখন ম্যাডামকে টেলিফোন করেছিলাম তখন নিশ্চয়ই আপনি সেখানে ছিলেন। ম্যাডামের আগের কথাগুলোর সঙ্গে এই যে আপনি কালেক্ট শব্দটা ব্যবহার করলেন তাতেই সেটা স্পষ্ট।'

'অনেক ধন্যবাদ। তবু আপনাকে আমি একটা পরামর্শ দেব।'

'কি ব্যাপারে?'

'এখানে আপনি দুজন লোককে সাদা রুমাল হাতে দেখছেন। দ্বিতীয়জন তো আপনার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে তবেই ব্যাগটা হাতবদল করা উচিত।'

'তার কি প্রয়োজন আছে?'

'হ্যাঁ। এতে ম্যাডান আপনার ওপর খুশী হবেন।'

'ভাল বলেছেন। কিন্তু এদের টেলিফোন খারাপ, কোথায় যাওয়া যায়?'

'এ পাড়ার কাউকে চেনেন না?'

'এ পাড়ায়? হ্যাঁ, মানে, আমার এক বান্ধবী, খুব ঘনিষ্ঠ নয়, ওর ফ্ল্যাটে টেলিফোন আছে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে। কিন্তু এই জল ভেঙে যাওয়াটাই আছে ঝামেলার।'

'আমার মনে হয় এদের পেছন দিকের দরজাটা দিয়ে গেলে আপনি জল নাও পেতে পারেন। আগে এ সব রেস্টুরেন্টের কিচেনের পাশ দিয়ে একটা দরজা থাকত।'

'আপনি?'

'আমি এখানে অপেক্ষা করি।'

'তার চেয়ে আমার সঙ্গে আসুন না। আসলে এই ব্যাগটাকে নিয়ে—।'

'আপনি বিল পে করেছেন?'

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।'

'আপনি এগোন, আমি আসছি।'

সাদাকালো চেকশার্ট যে তাকে বেশ বিশ্বাস করে ফেলেছে তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। নীলের দিকে মাথা নেড়ে লোকটা ভেতর দিকে এগিয়ে গেল। নীল দেখল কোণের টেবিলে বসা লোকটি এখন প্রায় ঘুরে বসেছে। নীল চলে এল নিজের টেবিলে। গ্লাসের সমস্ত তরল পদার্থ একেবারে গলায় ঢেলে দিল। তার খুব ভয় হচ্ছিল ওই লোকটা যেন চেকশার্টকে অনুসরণ করে ভেতরে না যায়। বোঝা যাচ্ছে তাকে বসে থাকতে দেখেই লোকটা সেরকম কিছু করছে না। হয়তো ভাবছে চেকশার্ট টয়লেটে গিয়েছে।

কিন্তু বেশী দেরি করাও উচিত নয়। এমন হতে পারে চেকশার্ট সম্পর্কে সে ভুল করেছে। লোকটা সত্যিকারের ধূর্ত বলেই সরল সাজতে পেরেছে। নীলের কথায় তাল দিয়ে এখান থেকে চম্পট দিয়ে দিয়েছে এর মধ্যেই। আর যদি তা হয় তাহলে বাইরে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে লোকটা। হঠাৎ নীল দেখল কোণের টেবিল ছেড়ে লোকটা ভেতরের দিকে পা বাড়াচ্ছে। সর্বনাশ হয়ে গেল। নীল সুটকেস দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেয়ারার হাতে টাকা গুঁজে লোকটাকে অনুসরণ করল। ভেতরের প্যাসেজের দুপাশে জেন্টস এবং লেডিস লেখা দরজা। লোকটা একটু ইতস্তত করে জেন্টস লেখা

দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতেই নীল সেখানে পৌঁছে গেল। এবং তখনই চোখে পড়ায় এবং মস্তিষ্ক কাজ করায় সে বাইরে থেকে টয়লেটের দরজাটার ছিটকিনি টেনে দিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল। কাজটা করতে কেউ তাকে দেখে ফেলল কি না তা সে ভ্রূক্ষেপ করল না।

জোরে জোরে পা ফেলে সে কিচেনের পাশের ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যে কয়েকজন কর্মচারীকে দেখতে পেল। তারা সম্ভবত বৃষ্টির কারণেই আজ খুব অবাক হল না। নীল দেখতে পেল চেকশার্ট একটা কার্নিশের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে কাছে এসে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'চলুন।'

'কি হয়েছে?' লোকটা হাঁটা শুরু করল।

'কেন?'

'আপনি বেশ হাঁপাচ্ছেন।'

'ও, এমনি।'

'সুটকেস নিয়ে বেরিয়েছেন কেন?'

'আমি আজই বাইরে থেকে ফিরেছি।'

'ও। কোথায় থাকেন আপনি?'

'এতদিন বাইরে কাজ করতাম। এবার কলকাতায় থাকার জায়গা খুঁজতে হবে।'

'ম্যাডাম আপনার মত লোককে দিয়ে কাজ করাতে পছন্দ করেন।'

'আপনি ম্যাডামকে কতটা চেনেন?'

'খুব কম।'

'দেখুন মশাই, আমরা কাজ করি পয়সার জন্যে। কম চেনাই ভাল।'

'যা বলেছেন।'

ওরা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে বেরিয়ে এল দুটো বাড়ির ফাঁক দিয়ে। এদিকের ফুটপাত থেকে জল নেমে গেলেও রাস্তা ভর্তি। নীল জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূর?'

'কাছেই।'

নীলের খুব ভয় হচ্ছিল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই লোকটা চেঁচামেচি করে দরজা খুলিয়েছে। ওর বুঝতে একটু অসুবিধে হবে না কোন্ পথে ওরা বেরিয়েছে। এখন এই নির্জন ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পা দিলে আধ মাইল দূরের মানুষও

লোকটার নজরে আসবে। দুটো ব্লক হেঁটে সাদাকালো চেকশার্ট পাশের সিঁড়িতে পা দিয়ে বলল, 'এই বাড়ি।'

ঝটপট ভেতরে ঢুকে পড়ার আগে নীল পেছন দিকে তাকিয়েও কাউকে যে দেখতে পায়নি এমন বিশ্বাস করল। বাড়িটা খুবই পুরনো ধাঁচের। কাঠের সিঁড়ি। ওপরে উঠতে উঠতে সাদাকালো চেকশার্ট বলল, 'ভাবছি তিতানের কাছে আপনার কি পরিচয় দেব !'

'আপনার বান্ধবীর নাম তিতান ?'

'হ্যাঁ, অবশ্য খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নয়।'

কয়েক পা ওপরে উঠে সাদাকালো চেকশার্ট পরা লোকটা দাঁড়িয়ে গেল। 'ইয়ে, তিতান একটু রাগী, মেজাজী বলাই ঠিক, তেমন কিছু করলে আপনি মনে নেবেন না !'

'ও, তা হলে আমি বাইরেই অপেক্ষা করব, ভেতরে যাওয়ার দরকার কি !' নীল চটপট বলল।

'না, ঠিক আছে, আসলে আমি তো আপনার নামটাও জানি না।'

'ম্যাডাম খুশী হবেন না।' নীল ঘাড় ঘুরিয়ে নিচের রাস্তা দেখল।

'তা ঠিক।'

'আমার নাম নীল, নীল রায়।'

'ও, আমি অমিতাভ দত্তগুপ্ত। আপনি বারংবার পেছনে তাকাচ্ছেন কেন ?'

'ওই লোকটা না এসে পড়ে !'

'আমাদের এখানে ঢুকতে দেখেছে ?'

'মনে হয় না।'

'ও, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আসুন।' অমিতাভ এবার বেশ সপ্রতিভ হয়ে আরও কিছু সিঁড়ি ভেঙে একটা দরজার সামনে পৌঁছাল। বেল বাজার বোতামে চাপ দিয়ে বলল, 'যা বৃষ্টি !' শব্দ দুটো উচ্চারণের সময় ওকে খুব বোকা বোকা দেখাল।

দ্বিতীয়বার বেল বাজানো মাত্র কী-হোলে চোখের তারা দেখা গেল। দরজাটা খুলল বেশ ধীরেই। নীল দেখল একজন মধ্যতিরিশের মহিলা, পরণে হাউজকোট, বেশ মোটুসুটু, মাথার উপর চুল চুড়ো করে বাঁধা, মুখে একরাশ বিরক্তি। তিনি কথা বলার আগেই অমিতাভ খুব নরম গলায় বলল, 'একটা ফোন করার জন্যে, মানে, খুব জরুরী— ।'

'কলকাতায় আর টেলিফোন নেই ?' বেশ চাঁচা গলা মহিলার। এঁর নাম তিতান ?

'আছে। মানে, যেখান থেকে চেষ্টা করছিলাম সেটা খারাপ।'

ভদ্রমহিলা দরজা খোলা রেখেই ভেতরে হেঁটে গেলেন। অমিতাভ বিজয়ীর মত মুখ করে নীলের দিকে তাকাল, 'আসুন, ফোনটা করে নিই।'

অতএব সুটকেশ হাতে নীলকে ঢুকতে হল। বিশাল বড় ঘর। মাঝখানে একটা প্লাইউডের আধা আড়াল। এ পাশে একটা সোফাসেট। ভদ্রমহিলা বললেন, 'একটা কাকও যেখানে বেরুচ্ছে না সেখানে উনি এসেছেন ফোন করতে। সঙ্গে লোক না থাকলে ঢুকতেই দিতাম না। তা যাকে নিয়ে এলে তার পরিচয়টা জানতে পারি ?'

অমিতাভকে খুব সপ্রতিভ দেখাল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ইনি নীল রায় আর ইনি তিতান। যার কথা বলেছিলাম আপনাকে।'

'ও, বলে কয়ে আসা হয়েছে ? কি বলেছ, বিশেষ বান্ধবী ?'

'না, না, ঠিক উল্টো।'

ভদ্রমহিলা এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলেছে বলুন তো ?'

সুটকেশ নামিয়ে রেখে নীল বলল, 'বলেছেন বান্ধবী কিন্তু ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নয়।'

'ছাতার মাথা। সত্যি কথাগুলো বলতে পুরুষমানুষগুলো কেন ভয় পায় কি জানি। আগে বলোনি, এখন বল আমার সামনে।' ভদ্রমহিলা হুকুম করলেন।

অমিতাভ যেন বাধ্য হলেন, 'আসলে, আমরা বিবাহিত ছিলাম—।'

'অপদার্থ স্বামী বলে আমি ওকে ডিভোর্স করেছি। তবু এখানে আসা চাই।' তিতান নামের মহিলাটি স্পষ্ট বিরক্তি জানালেন। নীল এবার বেশ অবাক। এরা এককালে স্বামী স্ত্রী ছিল ? অমিতাভ লোকটার সঙ্গে ওই ম্যাডামের সংযোগ হল কি করে ?

'এই বৃষ্টিতে সুটকেস নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?' তিতান প্রশ্ন করলেন।

'যাইনি, এলাম। বোম্বে থেকে।' নীল বলে ফেলল।

'বোম্বে থেকে ?' অমিতাভ অবাক হয়ে তাকাল।

নীল বুঝল কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সে হাসল, 'হ্যাঁ, আসা মাত্র কাজটা

করার হুকুম হল। এখনও হোটেলে যাওয়ার সময় পাইনি।'

অমিতাভর মুখের ভাব একটু নরম হল ব্যাখ্যা শুনে। সে এগিয়ে গেল টেলিফোনের কাছে। রিসিভার তুলে মাথা নাড়ল, 'লাইন আছে।' তারপর ডায়াল করতে লাগল। এখন কি হবে? ভদ্রমহিলা যদি এর মধ্যে খবর নাও পেয়ে যান তাহলেও অমিতাভর জানতে বাকি থাকবে না নীল দুনম্বর লোক। একটা কিছু করা দরকার। যে করেই হোক টেলিফোন করা থেকে—, কিন্তু কী করে? সে শুনল অমিতাভ 'হ্যালো' বলছে। তারপরই, 'আঃ ছাড়ুন আপনি, বুঝতে পারছেন না ক্রশ কানেকশন হয়ে গেছে, ইডিয়ট?' টেলিফোন নামিয়ে রাখল সে।

তিতান বলল, 'দিলে আমার ফোনের বারোটা বাজিয়ে। এখন যদি কেউ দরকারে আমাকে ফোন করতে চায় লাইন পাবে না। জীবনে কখনও খারাপ ছাড়া ভাল করতে পারলে না।'

অমিতাভ কথাগুলোকে এড়িয়ে যেতেই নীলের দিকে তাকাল, 'তাহলে?'

ততক্ষণ নীলের স্বস্তি ফিরে এসেছে। সে হাসল, 'আপনিই সিদ্ধান্ত নেবেন।'

'দূর মশাই। আমি তো তখনই আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু আপনার মনে সন্দেহ থাকত।' নীল সোফায় বসল। তিতান সেটা দেখল। এবার কোমরে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাষায় কথা হচ্ছে?'

অমিতাভ অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ও অন্যকথা।'

তিতান গলা তুলল, 'আমার ফ্ল্যাটে বসে এ সব চলবে না!'

নীল বলল, 'ম্যাডাম, আপনি উত্তেজিত হবেন না। ব্যাপারটা খুবই সামান্য। কিন্তু তার জন্যে দু রাত্তির ট্রেনজার্নি সত্ত্বেও আমি বিছানায় যেতে পারছি না।'

'কে মাথার দিব্যি দিয়েছে?'

'কেউ নয়। কর্তব্য। অমিতাভবাবুর হাতে যে ব্যাগটা দেখছেন সেটা আজ সন্ধ্যায় কোন এক জায়গায় পৌঁছে দেবার কথা ছিল—!' নীল এই পর্যন্ত বলামাত্র অমিতাভ উঠে দাঁড়াল আর তিতান চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি আবার আরম্ভ করেছ?'

নীল সেটা শুনেও না শোনার ভান করল, 'দুপুর থেকে যা বৃষ্টি তাতে

উনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারেননি। ড্রিমল্যান্ড রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করে গেছেন। উনি যে সেখানে আছেন তা টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাগটা যাঁকে দেওয়ার কথা তিনি দুজন লোককে আলাদা আলাদা ভাবে পাঠিয়েছেন ওঁর কাছে। উনি কাকে দেবেন ?'

মন দিয়ে কথাগুলো শুনে তিতান ঘুরে দাঁড়ালেন অমিতাভর দিকে, 'কি আছে ওতে ?'

'আমি জানি না, আমার জানার কথা নয়। আপনি মশাই অদ্ভুত লোক! লোক! এটা যে ম্যাডাম একদম পছন্দ করবেন না সেটা জোর দিয়ে বলতে পারি।' অমিতাভ বলল।

'ম্যাডাম ? ম্যাডাম কে ? এ্যাঁ ? আবার কাকে ফাঁসালে তুমি!' তিতান চ্যাঁচালো।

'আঃ। যা-তা বল না। ম্যাডামকে আমি ফাঁসাবো! আমার চোদ্দপুরুষ পারবে না।'

'ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ?'

'আমরা ওর সঙ্গে একটা কাজ করছি।'

'কি কাজ ?'

'সব কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে ? তাছাড়া আমরা তো এখন স্বামী-স্ত্রী নই।' বেশ সাহসী হয়েই কথাগুলো বলল অমিতাভ।

সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তিতান। ওর বিশাল শরীরের চাপে ছিটকে গেল অমিতাভ। হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গেল মেঝের ওপর। ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় থেকেই তিতান চিৎকার করছিল, 'তাহলে এখানে এসেছ কেন ? আমি কি ফ্যালনা ? আলবাৎ কৈফিয়ৎ দিতে হবে। একশবার। নইলে সব ফাঁস করে দেব।' কোনমতে নিজেকে তোলার সময় তিতান অমিতাভর ব্যাগটাকেও তুলে নিল।

অমিতাভ ছিটকে পড়েছিল সোফার ওপরেই। সেখান থেকে চিঁচিঁ করে বলল, 'দাও না ফাঁস করে! আমার কিছু হলে তুমি বাদ যাবে নাকি! মামদোবাজী।'

'আবার তুমি চোখ রাঙাচ্ছ ?' তিতান সোজা হয়ে দাঁড়াল।

নীল এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল। ব্যাগটা এখন তিতানের হাতের মুঠোয়। সে শান্ত গলায় বলল, 'নিজেদের মধ্যে মারপিট করে লাভ কি ?'

তিতান ফুঁসে উঠল, 'নিজেদের মানে? ও আমার নিজের লোক নাকি? আমার জীবন নষ্ট করেছে ওই লোকটা। আমার প্রথম স্বামীকে ও খুন করতে চেয়েছিল।'

'এ্যাই! বাজে কথা বল না।' অমিতাভ সোজা হয়ে বসল রাগী মুখ নিয়ে।

'চুপ করে থাকো। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি লোকটা খুব খারাপ ছিল। গুন্ডামি করত, আমার ওপর অত্যাচার করত। তাই বলে খুন করতে হবে? ভাগ্যি লোকটা ট্রেনে কাটা পড়ল পালাতে গিয়ে নইলে সারা জীবন জেলের ঘানি ঘোরাতে তুমি। তখন নতুন প্রেম। গলগল করে এসব কথা চিঠিতে উগরে দিয়েছিলে, মনে পড়ে? সেই চিঠি আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ডিভোর্স না দিলে বের করতাম। এখনও ছিঁড়িনি।'

অমিতাভ মিনমিন করল, 'তুমি কি চাও? আমি একটা ফোন করতে চেয়েছিলাম মাত্র, তুমি আমাকে—। ঠিক আছে, দাও।' হাত বাড়াল সে।

'কি আছে এতে? ম্যাডামটা কে? আবার কোন্ মেয়েছেলের পাল্লায় পড়েছ?'

'কোন্ প্রশ্নের উত্তর দেব?'

'কি আছে ব্যাগে?'

'আমি জানি না।'

'ম্যাডাম কে?'

'বিশ্বাস কর, তাও ভাল জানি না।'

'তাহলে মর গিয়ে! দূর হও এখান থেকে।'

'ব্যাগটা দাও।'

'কিস্যু পাবে না। যাও, ভাগো।' হাত তুলে দরজা দেখিয়ে দিল তিতান।

নীল চুপচাপ মহিলাটিকে দেখে যাচ্ছিল। সে এবার গম্ভীর গলায় বলল, 'ব্যাগটা আমাকে দিন।'

ঘাড় ঘোরাল তিতান। হয়তো নীলের গলার স্বর শুনেই তার গলা একটু নিচে নামল, 'কেন?'

'ওটা নিতে আমি এসেছি।'

'আপনি জানেন এর মধ্যে কি আছে?'

'না।'

'ওই ম্যাডামটিকে আপনি চেনেন?'

'না।'

'অদ্ভুত। দুজনেই এক কথা বলছেন?'

নীল উঠে দাঁড়াল, 'এসব ঝামেলার মধ্যে আপনার যাওয়ার কি দরকার বোন? তাছাড়া রাত হচ্ছে। আপনি আছেন নিজের ফ্ল্যাটে। আমাকে যেতে হবে জল ভেঙে হোটেল খুঁজতে। এমনিতেই ট্রেন জার্নি করে বেশ ক্লান্ত আমি। দিয়ে দিন।'

তিতান কিছু বলার আগেই নীল এগিয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুড নাইট।'

অমিতাভ চটপট বলে উঠল, 'আরে! আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

'আপনি তিতানের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিন।' নীল দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ও থমকে দাঁড়াল। তাড়াহুড়োতে নিজের স্যুটকেসটাকে ওপরে ফেলে এসেছে। ওটাকে ফেলে যেতে পারে না সে। ধীরেসুস্থে আবার ওপরের দিকে পা বাড়াল নীল। এবং তখনই ধড়াম করে একটা শব্দ বাড়িটা কাঁপিয়ে দিল। শব্দটা এল তিতানের ফ্ল্যাট থেকে। সে এক দৌড়ে ওপরে উঠে আসতেই দেখতে পেল অমিতাভ মুখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। তাকে দেখামাত্র ডুকরে উঠল, 'না, না, আমি চাইনি।'

নীলের চোখ এবার তিতানের শরীরের ওপর। মেঝের ওপর পড়ে আছে তিতান, ওর শরীরের ওপর একটা লম্বা টুল পড়ে আছে। নিশ্চয়ই অমিতাভ টুলটা দিয়ে আঘাত করেছে তিতানকে। তিতানের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাগটাকে স্যুটকেসের পাশে রেখে নীল হাঁটু মুড়ে বসে টুলটাকে সরাল। তারপর ধমকের গলায় বলল, 'একটু জল আনুন।'

অমিতাভ যেন সম্বিত ফিরে পেল। কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ দরজার দিকে ঘুরে সে প্রচণ্ড জোরে ছুটতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। নীল এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল যে প্রথমে ঠাওর করতে পারেনি। করা মাত্র তার শরীরে হিমস্রোত বইল। আঙুল বাড়িয়ে তিতানের খোলা চোখে টানতেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় চোখ খোলাই রইল। মেয়েটা মরে গেছে। আর মরে গেছে বলেই অমিতাভ পালিয়ে গেল। এখন এই ফ্ল্যাটে একটি মৃতদেহের সঙ্গে সে একা। যে

কেউ এখানে ঢুকলে···। নীল উঠে দাঁড়াল। মেয়েটাকি সত্যি মরে গেছে? এখনও চিকিৎসা করালে বেঁচে যেতে পারে কি? এই সময় নিচের কাঠের সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হল। কেউ ওপরে উঠে আসছে। এই ফ্ল্যাটেই আসছে নাকি? দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজাটাকে প্রায় নিঃশব্দে বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল নীল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল দ্বিতীয় ভুলটা হয়ে গেল। এখন যদি কেউ দরজা খুলতে বাধ্য করে তাহলে তার হাতে কোন প্রমাণ থাকবে না। ফাঁসি না হলেও সারা জীবন জেলের ভাত খেতে হবে। সিঁড়ি বেয়ে শব্দটা উঠে এল ওপরে। তারপর আরও ওপরে উঠে যেতে লাগল। হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল নীলের। শব্দটা মিলিয়ে যেতে সে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে চাইল। এক ফোঁটা ঘাম বের হয়নি। তার কপাল হিম হয়ে আছে।

এখান থেকে এখনই পালানো দরকার। দরজা খুলে সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবে? কেউ যদি দেখতে পায়? সে তিতানের শরীরটাকে দেখল। স্থির হয়ে আছে। এক চোখ খোলা বলে বিশ্রী দেখাচ্ছে। এই ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বের হবার দ্বিতীয় কোন দরজা আছে? সুটকেস এবং ব্যাগটাকে তুলে সে ভেতরের ঘরে ঢুকল। এটা তিতানের বেডরুম। মেয়েটা ঝগড়াটে টাইপের, একাই থাকত। এই ধরনের মেয়ে একা থাকলে কেউ ঝামেলা করতে সাহস পায় না। সে টয়লেটে ঢুকল। নাঃ কোন পথ নেই।

শেষ পর্যন্ত বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল নীল। দরজাটাকে বন্ধ করল। অস্বস্তি হচ্ছিল তার। মনে হচ্ছিল নিচের রাস্তায় তার জন্যে কোন বিপদ অপেক্ষা করছে। হয়তো অমিতাভ তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। কিংবা অমিতাভর সঙ্গে ড্রিমল্যান্ডের সেই লোকটার দেখা হয়ে গেছে এবং ওরা একসঙ্গে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সাপের মত নিঃশব্দে নীল ওপরে উঠে গেল। তিনতলার ফ্ল্যাটগুলোর দরজা বন্ধ। সে চারতলায় উঠে আসতেই জড়ানো গলার চিৎকার শুনতে পেল। পুরুষ-কণ্ঠ দাবী করছে সে বেশী ভালবাসে। কিন্তু নারী-কণ্ঠ সেই দাবী নস্যাৎ করে বলছে তার ভালবাসা অনেক বেশী। ওই ফ্ল্যাটের দরজা ঈষৎ খোলা। নীল বুঝল এরা দুজনেই নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। সে ছাদে উঠে এল।

এককালে দরজা ছিল, সেটা বন্ধও হত। এখন কে কার খেয়াল রাখে।

নীল দুহাতে সুটকেস এবং ব্যাগ নিয়ে ছাদের প্রান্তে চলে এল। বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেজা ছাদে যথেষ্ট শ্যাওলা। সে ঝুঁকে দেখল ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে তখনও জল পুরোপুরি সরেনি। কোন মানুষ অথবা গাড়ির দেখা নেই। এমন হতে পারে তার জন্যে কেউ অপেক্ষায় নেই এই বাড়ির দরজায়, কিন্তু মনে যদি সন্দেহ ঢোকা মারে তবে তাকে মিথ্যে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ঝেড়ে ফেলবে কোন্ যুক্তিতে? নীল দুপাশের বাড়িগুলো দেখল। দূরত্ব অনেকখানি। সে ছাদের পেছন দিকে চলে আসতেই ঘোরানো সিঁড়িটাকে দেখতে পেল! সিঁড়িটা নিচ থেকে চারতলার জানলার পাশে এসে শেষ হয়ে গেছে। লোহার সিঁড়ির সর্বত্র রেলিং নেই। এককালে জমাদারদের যাওয়া-আসার পথ এখন পুরোপুরি বাহুল্য। সদর দরজা এড়াতে হলে ওই সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তার জন্যে চারতলার ফ্ল্যাটে ঢোকা দরকার। নীল এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর নেমে এল চারতলার সেই আধখোলা ফ্ল্যাটের দরজার সামনে। এখন স্ত্রীকণ্ঠ বলছে, 'তোমাকে আজ পর্যন্ত কটা মেয়ে ভালোবেসেছে বল?'

পুরুষকণ্ঠ জড়ানো স্বরে পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'আগে তুমি বল।'

স্ত্রীকণ্ঠ হেসে উঠল, 'ইয়ার্কি! আমারটা জেনে নিয়ে তুমি তার বেশি বলবে।'

পুরুষকণ্ঠ বলল, 'না, না, আমি অনেস্ট, সততাই মূলধন।'

স্ত্রীকণ্ঠ চুক চুক করল, 'চুনুচুনু, সোনাটা, পুরুষ জাতটাকে আমার জানা আছে।'

পুরুষকণ্ঠ বলল, 'বেশ বাজী রাখ। দুজনের মধ্যে কে সৎ প্রমাণ হোক।'

নারীকণ্ঠ বলল, 'হোক। কিন্তু কি ভাবে?

নীল এবার দরজায় নক্ করল। সে ইচ্ছে করেই বেল বাজাল না। তৎ-ক্ষণাৎ পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, 'ওই যে, এসে গিয়েছে। সততার জয় সর্বত্র। ভগবান পাঠিয়ে দিলেন। কাম ইন, কাম ইন প্লিজ।'

নীল কনুই দিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে ঈষৎ ঝুঁকে নমস্কার জানাল। তারপর বেশ সতর্ক ভঙ্গীতে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরের মাঝখানে বিরাট সোফার দুপাশে দুজন মানুষ আধশোওয়া হয়ে আছে। দুজনের চোখেই বিস্ময়। দুজনেই মধ্য বয়সের। সামনে তৃতীয় শ্রেণীর স্কচের বোতল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মহিলা জড়ানো গলায় বলল, 'আরে শ্বাস! একেবারে স্যুটকেস নিয়ে চলে এসেছে। কোত্থেকে এল!'

নীল বলল, 'ঈশ্বর পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

পুরুষটি চেঁচিয়ে উঠলো, 'মাই গড ! ও মাই গড ! ইউ আর গ্রেট।'

মহিলা হাত নাড়লেন, 'আস্তে।'

নীল জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি বসতে পারি ?'

মহিলা চোখের ইঙ্গিতে সম্মতি জানালেন।

উল্টোদিকের সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়েও স্বস্তি এল না নীলের। দরজাটার ল্যাচ ঠিক মত কাজ করে কিনা কে জানে! সে সামনে তাকাল! মাতাল তার অনেক দেখা আছে। কিন্তু মহিলাটির হুঁশ পুরুষটির চেয়ে বেশী মনে হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সমস্যা কি ?'

পুরুষটি যেন উৎসাহ পেল। চট করে গ্লাসের বাকিটা গলায় ঢেলে বলল, 'আমরা দুজনে দুজনকে খুব ভালবাসি। কিন্তু কে বেশী ভালবাসে তা বলতে হবে আপনাকে।'

নীল বলল, 'বেশ।'

মহিলা বলল, 'হে দেবদূত ! আপনি কি স্কচ খান ?'

নীল মাথা নাড়ল, 'না। দ্বিতীয় কোন সমস্যা আছে ?'

মহিলা বলল, 'হ্যাঁ। আমরা কে কত ভালবাসা পেয়েছি। কে জিতবে ?'

পুরুষ বলল, 'ঠিক ঠিক।'

নীল বলল, 'বাঃ। দুটো প্রশ্ন একটা উত্তর থেকেই শেষ হয়ে যায়। যে বেশী ভালবাসে তার মধ্যে সেই গুণ আছে বলেই অনেকের ভালবাসা পেয়ে এসেছে। ভালবাসতে না জানলে সে ভালবাসা পাবে কি করে, তাই না ?'

পুরুষ বলল, 'ঠিক ঠিক।'

নীল বলল, 'নিজেরাই বলে দিন না কে কতজনকে আগে ভালবেসেছেন ?'

পুরুষ বলল, 'নো। আমরা আলাদা আলাদা বলব।'

মহিলা বলল, 'তুমি ও ঘরে নিয়ে যাও ওঁকে, গিয়ে বল তাহলে।'

পুরুষ ওঠার চেষ্টা করে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল। তারপর বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল, 'চলে আসুন দেবদূত। ব্যালটে ভোট হোক।'

নীল ওকে অনুসরণ করল। মহিলা হাসি হাসি মুখে গ্লাস ধরল। পাশের ঘরে ঢুকে নীলের হাত ধরে পুরুষটি দাঁড়াল, 'সত্যি বলব ?'

'বলুন।'

'কাউকে বলবেন না ?'

'না।'

'আজ পর্যন্ত কোন মেয়েছেলে আমাকে ভালবাসেনি। মাইরি বলছি।'

'সে কি!'

'ইয়েস। প্রত্যেকে আমাকে খেলিয়েছে।'

'একথা বললে যে আপনি হেরে যাকেন।'

'নো, আমি জিততে চাই।'

'ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'আমি হেরে যাব না তো!'

'বললাম তো, ভরসা রাখুন।'

'থ্যাংক ইউ।' পুরুষটি টলতে টলতে বাইরের ঘরে চলে গেল। নীল শুনল লোকটা চেঁচিয়ে বলছে, 'ডালিং, এখন তোমার টার্ন। যাও, ভেতরে যাও।'

নীল মহিলাকে এগিয়ে আসতে দেখল। ঈষৎ কাঁপুনি থাকলেও অনেক সোজা। সামনে এসে দাঁড়াতেই নীল গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল, 'কজন ছেলে আপনাকে ভালবেসেছে?'

মহিলা ঠোঁট মুচড়ে উঠল। লাল যেন আরও লাল হল, 'ছেলেরা ভালবাসতে জানে? আপনার কি মনে হয় দেবদূত?'

'আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না।'

'আজ পর্যন্ত যারা আমার কাছে এসেছে তারা এই শরীরের আকর্ষণে এসেছে। প্রথম প্রথম বোকামি করতাম, এখন করি না। এই যে, ওকে বিয়ে করার আগে সমস্ত কিছু ভাল করে বুঝে নিয়ে তবে করেছি।' মহিলার ঢুলু ঢুলু চোখে হাসি।

'কবে বিয়ে হয়েছে?'

'পনের দিন।'

'তাহলে আপনাকে কেউ ভালবাসেনি?'

'নো, নেভার। ভালবাসার ভান করেছে।'

'একথা বললে তো আপনি হেরে যাবেন।'

'তাই?'

'নিশ্চয়ই।'

মহিলার একটা হাত সাপের মত উঠে এল নীলের বুকে, 'দেবদূত, আপনি আমাকে হারিয়ে দেবেন? পারবেন দিতে?'

নীল মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। ওঘরে চলুন, ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'আপনি কোত্থেকে এলেন ?'

'বোম্বে থেকে ?' ফস করে বলে ফেলল নীল।

'হুম্। হাতে জলপরীর উল্কি, বাঙালিরা উল্কি আঁকায় না, আপনি বাঙালি ?'

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নীল। যা হবার তা হয়ে গেছে। যদি মহিলার নেশা গভীর হয় তাহলে পরে কথাগুলো ভুলে যাবেন। সে হাসল, 'আমি জাহাজে কাজ করি।'

'তাই বলুন। আপনি নাবিক। এ বন্দর থেকে ও বন্দর, তাই ?'

'চলুন।'

'কোথায় ?'

'ওই ঘরে।'

'কিন্তু আপনি দেবদূত নন। আমি হেরে গেলে আপনি বিপদে পড়বেন।'

পুরুষটি চোখ বুজে পড়েছিল সোফায়। মহিলা 'ডার্লিং' বলতেই চোখ খুলল, 'কে জিতল ?'

'আমি জিতলে তুমি খুশী হও না ?'

'নো, নো।'

নীল বলল, 'আমি একটু সময় নিচ্ছি। তার আগে আপনাদের টয়লেটে যাব একবার।'

মহিলা হাত তুলে টয়লেট দেখিয়ে দিতে নীল এগোল। বিশাল টয়লেট। এখনকার মত ব্যবস্থা নয়। সাহেবী গন্ধ আছে। পেছনে একটা দরজা! দরজাটি বহু বছর খোলা হয় না। অনেক কসরত করার পর বেশ প্রতিবাদের সঙ্গে দরজা খুলল। নীল মুখ বাড়াতেই লোহার সিঁড়িটাকে দেখতে পেল। হাত বাড়িয়ে সেটাকে ধরতেই একটু নড়ে উঠল যেন। এত পুরনো, সিঁড়ি, ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে, কিন্তু এ ছাড়া কোন উপায় মাথায় আসছে না।

নীল ঘরে ফিরে এল, 'সমাধান হয়ে গিয়েছে। আপনাদের একটা কাজ করতে হবে।'

পুরুষটি কোনরকমে উঠে দাঁড়াল, 'আলবাৎ।'

'টয়লেটের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে যে নামতে পারবে নিচে সে আপনাদের সেরা।' নীল বেশ ভাল মানুষের মত ঘোষণা করল।

'আমি যাচ্ছি। এ ত জলের মত সোজা।' টলতে টলতে পুরুষটি এগোতেই মহিলা তাকে হাত ধরে আটকালেন, 'ওই সিঁড়ি দিয়ে কেউ নামতে পারবে না। মরচে পড়া সিঁড়ি।'

'আপনি ভয় পাচ্ছেন!'

'আপনি নেমে দেখান প্রথমে তারপর আমরা নামব।'

নীল মাথা নাড়ল, 'বেশ। এবং খালি হাতে নয়, আমার মালপত্র নিয়ে নেমে আপনাকে বুঝিয়ে দেব যে ওই সিঁড়ি দিয়ে নামা যায়।'

পরিকল্পিত পথে ব্যাপারটা এগোতে নীল তার সুটকেস এবং ব্যাগ তুলে নিয়ে চলে এল টয়লেটে। পুরুষটিকে সোফায় ছেড়ে দিয়ে মহিলা সেখানে এসে দাঁড়িয়ে কিছুটা ঝুঁকলেন, 'ও মা! আপনি নির্ঘাৎ মরে যাবেন।'

'জীবনে তো একবার মরতে হবে।' নীল পা বাড়িয়ে লোহার সিঁড়িতে চাপ রাখল। দুলে উঠল সিঁড়িটা, তারপর স্থির হল। দুটো হাত আটকে রাখলে নিচে নামা যাবে না। এক হাতে দুটো জিনিস ধরাও অসম্ভব। নীল অমিতাভর ব্যাগটা পায়ের চাপে রেখে বাঁ হাতে সুটকেস, ডান হাতে রেলিং ধরে ধীরে ধীরে নামতে লাগল। সিঁড়িটা দুলছে। হয়তো দুই কিংবা এক-তলার দেওয়ালের হুকে ওটা এখনও আটকে আছে। সেই বাঁধন খুলে গেলে পেছনের বাড়িগুলোর ওপর আছাড় খেতে হবে। হাত বাড়িয়ে মাথার কাছ থেকে অমিতাভর ব্যাগটা তুলে কোনমতে কোমরের কাছে সিঁড়ির ধাপে রেখে নীল আবার নামতে লাগল। কয়েকটা ধাপ নামছে আর ব্যাগটাকে একটু একটু করে নামিয়ে আনছে। সেই সময়টুকু খুবই বিপদজনক। সামান্য গোলমাল হলে নিচে পড়ে যেতে হবে কারণ সে কোন হাতেই রেলিং ধরার সুযোগ পাচ্ছে না। প্রায় তিরিশ মিনিট সময় লাগল মাটিতে পা রাখতে। এই তিরিশ মিনিট যেন অনেকটা আয়ু কমিয়ে দিল নীলের। সে ওপরে মুখ তুলে দেখল মহিলা এখনও ঝুঁকে তাকে দেখছে। কথা বলেনি এই রক্ষে। নীল সুটকেস আর ব্যাগ নিয়ে বাড়িটার পেছনের গলি দিয়ে হাঁটতে লাগল। সামনের রাস্তায় কেউ যদি তার জন্যে অপেক্ষায় থাকে তাহলে তার কিছু করার নেই।
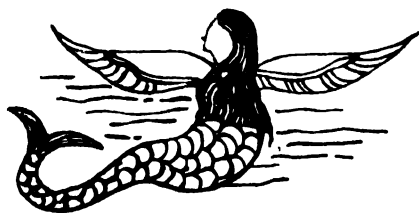
এখন রাস্তায় জল নেই। আকাশে মেঘ জমজমাট হলেও বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। ইলিয়ট রোডের বাঁকটা নিতেই সে খুশী হল। আলো জ্বলছে টেডিলালের হোটেলে। নিচের রেস্টুরেন্টটা তো এক সময় মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকত। অবশ্য এখন মধ্য রাতের সীমায় সময় পৌঁছে গেছে।

নিচে রেস্টুরেন্ট, পেছনে হোটেল। নীল রেস্টুরেন্টে ঢুকল। কাউন্টারে একটা অচেনা ছেলে। চুল ঘাড় পর্যন্ত কেয়ারি করা। নীলকে দেখে বলল, 'খানা খতম হো গিয়া।'

নীল হেসে বলল, 'সুটকেস নিয়ে এত রাত্রে কেউ শুধু খেতে আসে না, থাকতেও চায়। টেডিলালজী কোথায় ?'

ছেলেটি নিঃশব্দে ভেতরে যাওয়ার প্যাসেজ দেখিয়ে দিল।

নীল একটু এগোতেই হোটেলের কাউন্টারটার কাছে পৌঁছে গেল। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো টেডিলাল একটা কাজের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। নীল কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই অভ্যস্ত ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল, 'বলিয়ে !'

'ঘর চাই। সিঙ্গল সিটেড।'

সামনের বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখা চাবিগুলোর দিকে তাকাল টেডিলাল। এই সময় নীল বলল, 'লালে লাল টেডিলাল।'

চমকে ফিরে তাকাল টেডিলাল। ওর চোখে মুখে বিস্ময় চলকে উঠল। তারপর চিৎকার করে জড়িয়ে ধরল সে নীলকে, 'আরে তুম, এতনা সাল কাঁহা থা লাল ?'

ছেলেবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে ছড়া কাটত সে টেডিলালকে দেখে। প্রথম প্রথম রেগে যেত লোকটা, পরে মজা পেত। বলত, 'তুম নীল হো তো ম্যায় লাল।'

অনেকটা আবেগ বিনিময়ের পর নীল একটা দশ বাই বারো ঘরে আশ্রয় পেল। একটু খাতির বিছানার চাদর পাল্টানোতে বোঝা গেল। টেডিলাল স্বয়ং ঘরে এল, 'আজ খুব ভাল লাগছে। তোমার মায়ের খবর তো জেনেই

গিয়েছিলে। আর সব কোথায় গিয়েছে জানি না। এই ইলিয়ট রোড আর সেই ইলিয়ট রোড নেই।'

জামা প্যান্ট ছেড়ে টয়লেটে যাওয়ার উপক্রম করছিল নীল, বলতে হয় তাই বলল, 'সময় কি এক জায়গায় বসে থাকবে ?'

'তা নয়। চুল তো আমারও পেকেছে। আগে সাহেবরা থাকত এখানে। গুণ্ডা বদমাস দু-একজন থাকলে ভদ্রলোকই বেশী থাকত। এখন খুঁজতে হয়। সাদা চামড়ার সাহেব মেম দেখতে হলে দিন কেটে যাবে। কদিন থাকবে ?'

'দেখি। খুব খিদে পেয়েছে। খাবার তো পাওয়া যাবে না।'

'কে বলল ? পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও হ্যাঁ, পাশের জানালাটা খুলো না।'

'কেন ?'

'ওটা একটা রান্ডিখানা। পুলিশকে টাকা দিয়ে চালাচ্ছে।'

টেডিলাল চলে গেলে দরজা বন্ধ করে নীল প্রথমে অমিতাভর ব্যাগটার দিকে তাকাল। কি আছে ওর মধ্যে ? এতক্ষণ চেপে রাখা কৌতূহল এবার ছোবল মারছিল। কিন্তু নিজেকে সামলালো সে। না, ফ্রেশ হয়ে আসা যাক। ওটা তো পালিয়ে যাচ্ছে না ?

স্নান শেষ করে পরিষ্কার পোশাক পরে ঘরে দাঁড়িয়ে আধখাওয়া বোতলটা বের করে খানিকটা গলায় ঢালতে না ঢালতেই দরজায় শব্দ হল। দরজাটা খুলতে খাবারের প্লেট নিয়ে ঢুকল ছোকরা, 'মালিক জিজ্ঞাসা করছে আপনি যে এসেছেন তা কাউকে জানাবে কিনা ?'

নীল বলল, 'না। আমি একদম একা থাকতে চাই।'

ছেলেটা চলে গেলে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করল নীল। তারপর ব্রিফকেসটাকে খাটের ওপর রেখে খোলার চেষ্টা করল। তালার ব্যবস্থা নেই। চাপাচাপি করতেই ওটা খুলে গেল। একটা মাঝারি সাইজের খাম ছাড়া কিছু নেই ওর মধ্যে। খামের মুখটা বন্ধ। ওপরে কিছু লেখা নেই। প্রচণ্ড হতাশ হল নীল। এর জন্যে এত ঝুঁকি নিয়েছে সে ? ফোনে কথাগুলো শোনা ইস্তক মনে হচ্ছিল বহুমূল্যবান কিছু হাত বদল হতে যাচ্ছে। সে খামটাকে বিরক্ত ভঙ্গিতে খুলতেই ঝুরঝুর, করে ফটোগ্রাফ বেরিয়ে এল খাটের ওপরে। সেই-সঙ্গে নেগেটিভের বান্ডিল। গোটা কুড়ি ছবি। বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেল নীলের, সব কটা ছবি একটা মেয়ের। পৃথিবীতে এত সুন্দর ফিগার কোন মেয়ের থাকতে পারে ? মেয়েটির শরীরে একটা সুতো পর্যন্ত নেই। বছর

পঁচিশের বেশী বয়স কিছুতেই হতে পারে না। চাহনি অত্যন্ত চটুল কিন্তু শরীরের আবেদন তার অনেকগুণ বেশী। মেয়েটি এইসব ভঙ্গিতে ক্যামেরা-ম্যানকে ছবি তুলতে দিয়েছে স্বইচ্ছায় নইলে মুখে এমন মদির হাসি রাখে কি করে? কে মেয়েটি? নীল এক ঢোঁক মদ খেল।

ছবিগুলোকে পাশাপাশি বিছানার ওপর সাজিয়ে রাখল সে। একটু তাকালেই বুকের ভেতরটা যেন নড়েচড়ে উঠল। ম্যাডাম বলে যাকে চিহ্নিত করছিল অমিতাভ এগুলো তার ছবি? অসম্ভব। ম্যাডামের গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গী বলে দেয় বয়স ঢের হয়েছে। তাহলে এই ছবি ম্যাডামের কাছে এত জরুরী কেন? যে গলায় ভদ্রমহিলা ধমকাচ্ছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল সোনার বিস্কুটের প্যাকেটের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এই রকম দুর্যোগের রাত্রেও তিনি লোক পাঠিয়েছেন ছবিগুলোর জন্যে? নাকি এগুলো হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না!

ছবিগুলো খাটে সাজিয়ে রেখেই টেবিলে চলে এল সে। খিদে যে জব্বর পেয়েছে তা খাবার মুখে দিতেই টের পেল। খেতে খেতে চেয়ারে বসে সে খাটের ছবিগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল ছবিগুলো কি সোনার বিস্কুটের মত দামী?

খাবার ছেড়ে সে এগিয়ে এসে ঈষৎ ঝুঁকে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। এই মেয়ের জীবনে অভাব শব্দটার অস্তিত্ব নেই। মাখনের মত নরম চামড়ায় যে লালিত্য তা প্রচুর যত্ন ছাড়া তৈরী হয় না। মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ে নিজের পা থেকে মাথার চুল এমন যত্নে সাজায় না। তার মানে এ অত্যন্ত ধনী পরিবারের মেয়ে। এই মেয়ে নগ্ন অবস্থায় ছবি তুলিয়েছে। অমিতাভর ম্যাডামের এই ছবিগুলো দরকার, কারণ তিনি এগুলো থেকে ভাল উপার্জন করতে পারবেন। সেই পুরোনো ব্ল্যাকমেলিং-এর গল্প।

কিন্তু মেয়েটি ছবিগুলো তোলালো কেন? এই ধরনের মুখের মেয়ে অশিক্ষিত হতে পারে না। যে ফটোগ্রাফার ছবিগুলো তুলেছে সে সঙ্গে নেগেটিভগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে। নীল নেগেটিভ দেখল। কুড়িটা নেগেটিভ। ছবি আর নেগেটিভ মিলিয়ে নিল সে। তারপর আবার টেবিলে ফিরে গিয়ে খেতে শুরু করল। মেয়েটা তার কাছের কোন মানুষকে দিয়ে ছবিগুলো তুলিয়েছে। সেই মানুষটি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ম্যাডামের নিশ্চয়ই মেয়েটির ওপর অনেক দিনের নজর ছিল। নইলে হঠাৎ করে এমন

ছবি তোলানোর ব্যাপার জানার কথা নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, ছবিগুলো তোলা হয়েছে ছাদের ওপরে, আকাশ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির নিজের বাড়ি না ফটো-গ্রাফারের ?

খাওয়া শেষ করে আবার ছবিগুলো নিয়ে বসল নীল। তার কেমন জেদ চেপে যাচ্ছিল। এখন রাত আড়াইটে। পৃথিবী চুপচাপ। মেয়েটি অদ্ভুত হাসিমুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এরকম মেয়ের জন্যে সাতবার আত্মহত্যা করা যায়।

দরজা ধাক্কানোর শব্দে ঘুম ভাঙল নীলের। সে সাড়া দিল। কবজি ঘুরিয়ে সময় দেখল, সকাল সাড়ে দশটা। তার পরেই খেয়াল হল। বালিশের পাশে রাখা ছবিগুলোকে খামে চালান করে দিয়ে সে উঠল দরজা খুলতে। গত রাত্রের ছোকরাটা চায়ের পট নিয়ে ঘরে ঢুকে জানাল তার মালিক দুবার ঘুরে গেছে। এত বেলা পর্যন্ত কোন বোর্ডার ঘুমায় না কিন্তু মালিকের হুকুমে সে চা নিয়ে এসেছে।

নীল বলল, 'আমি যাওয়ার সময় তোকে খুশি করে দেব।'

ছেলেটা আনন্দিত গলায় জানতে চাইল, 'ব্রেকফাস্ট খাবেন সাব ?'

'একটু পরে।'

গত রাত্রের থাকা গ্লাস তুলে নিতে নিতে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, 'ওই জানলা কাল রাত্রে খোলেননি তো সাব ?'

'কেন রে ?' অন্যমনস্ক নীল ব্রাশে পেস্ট লাগাচ্ছিল।

'মেয়েটা খুব বদমাস। নাম চাঁদ। এর আগে একজন কাস্টমারকে ফাঁসিয়েছিল।'

'বুঝলাম।'

'তেমন দরকার হলে আমাকে বলবেন সাব। আমি এখানকার সব মেয়েকে চিনি।'

'সব মেয়েকে চিনিস ?'

'লাইনে বে-লাইনে সব।'

'তাই। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাড়িগুলোর ?'

'হ্যাঁ। তবে কম। ওখানে বহুৎ গোলমাল। কাল রাত্রে একটা মার্ডার হয়েছে।'

'মার্ডার ?'

'হ্যাঁ। মেয়েটা একা থাকত।'

'কে বলল তোকে ?'

'বাঃ, সকাল থেকে পুলিশের ভ্যান ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই জানে।'

'ঠিক আছে, তুই আধঘণ্টা পরে দুটো টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ নিয়ে আয়।

ছেলেটি চলে যেতে নীল ব্রাশ করতে করতে তিতানের মুখ মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু খবরটা পুলিশকে কে দিল ? অমিতাভ। না, তা হতে পারে না। নিজেই জড়িয়ে যাবে তাহলে। হয়তো পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন পুলিশকে জানিয়েছে।

পরিষ্কার হয়ে নীল চায়ে চুমুক দিল। পুলিশ কি তার কথা জানতে পারবে ? এক যদি সেই মাতাল স্বামী-স্ত্রী তার কথা পুলিশকে জানায় তাহলে— ! কিন্তু পরিচয় পাওয়ার কোন উপায় নেই পুলিশের।· চা খেয়ে ছবিগুলো বের করল সে। এবং হঠাৎই একটা ছবিতে লম্বা সাদা বাড়ি দেখতে পেল। যে ছাদে ছবি তোলা হয়েছে সাদা বাড়িটা তার পেছনে। অন্তত আট-তলা বাড়ি। বাড়িটার ওপরে দড়ি থেকে একটা গ্যাস বেলুন উড়িয়ে রাখা হয়েছে। নীল অন্য ছবিগুলোতে বাড়িটাকে খুঁজল। অ্যাঙ্গেল পাল্টে যাওয়ায় কুড়িটার মধ্যে মাত্র দুটোতে বাড়িটা এসেছে। হ্যাঁ, আটতলা বাড়ি। বেলুনের রঙ নীল। গায়ে একটা কিছু লেখা, ঝাপসা। হয়তো কারো বিজ্ঞাপন। উল্টোদিক দিয়ে হিসেব করলে সাদা বাড়িটা থেকে ছবি তোলার বাড়ি পূর্ব-দক্ষিণ দিকে পড়বে বলে মনে হয়।

কলকাতায় এরকম বাড়ি কটা আছে ? সাদা ঝকঝকে আটতলা বাড়ি যার মাথায় বেলুন উড়ছে। নীলের মনে হল এরকম বাড়ি একগাদা থাকতে পারে না। কিন্তু বাড়িটাকে খুঁজে বের করলেও লাভ কি ! ওই বাড়ির আশপাশের কোন ছাদে এই মেয়েটির ছবি তোলা হয়েছে তা কি করে জানা যাবে ! নীল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর কিছু না হোক, এমন চেহারার মেয়েকে যদি একবার চোখে দেখা যেত ! জাহাজে জাহাজে অনেক বন্দর ঘোরা হল কিন্তু এমন ফিগার, অমন চাহনি কোথাও দ্যাখেনি সে।

ঘরের এককোণে যে টেবিল এবং তার লাগোয়া আয়না, নীল চলে এল সেখানে। রুক্ষ, রাগী চেহারার এক মানুষের প্রতিবিম্ব দেখা দিল সেখানে। নিজের গালে আঙুল বোলালো সে। কয়েকদিন না কামানোয় মুখের চেহারা আরও খারাপ হয়েছে। নিজের শরীর ভাল করে দেখল সে। দেখতে দেখতে

তার ঘুম পেয়ে গেল। দীর্ঘ ট্রেনযাত্রা, ট্রেনযাত্রার পরে একটার পর একটা টেনসন, কয়েক ঘণ্টার ঘুম তা মুছে ফেলার পক্ষে নিতান্তই কম। ছবিগুলোকে একপাশে সরিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল নীল।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন কলকাতায় ভরদুপুর। দরজায় শব্দ হচ্ছে। নীল কোনরকমে সেটা খুলতেই ছেলেটাকে দেখতে পেল, 'কি ঘুম আপনার স্যার! তিন তিন বার ডেকে গিয়েছি, ব্রেকফাস্ট নষ্ট হল তবু আপনি উঠলেন না।'

নীল হাসল, 'আমি যে এত টায়ার্ড ছিলাম তা জানতাম না।' সে কয়েক পা হেঁটে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ ফুলে ফুটবল হয়ে গেছে।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'লাঞ্চ ঘরে খাবেন স্যার?'

মাথা নাড়ল নীল, 'আধঘণ্টা পরে। কি পাওয়া যাবে?'

'সব কিছু।' ছেলেটার একটুও আড়ষ্টতা নেই।

'দুপিস পাউরুটি, দুটো ডিমের ওমলেট আর একটু ভেজিটেবল সুপ।'

'ব্যাস?'

'হ্যাঁ। আমি এর বেশী লাঞ্চে কিছু খাই না। তোমার নামটা যেন কি?

'সবাই আমাকে জ্যাকি বলে ডাকে স্যার।'

'বাঃ। তা জ্যাকি, কালকের সেই মার্ডার কেসটার কোন খবর আছে?'

'হ্যাঁ স্যার। খুনী ধরা পড়ে গেছে।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'হ্যাঁ স্যার। ওই মেয়েটার আগের স্বামী। কেউ কেউ বলছে নিজেই ধরা দিয়েছে। কেউ কেউ বলছে ভেতরে অন্য গল্প আছে। স্বামী বউকে মার্ডার করলে কেস ঠিক জমে না, না স্যার?' জ্যাকি খুব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'হুঁ।' নীল অবাক হল। ওইভাবে পালিয়ে গিয়েও অমিতাভ কেন নিজে যেচে পুলিশের কাছে গেল? হিসেবটা কিছুতেই মিলছে না।

'স্যার, ওই জানলাটা খোলেননি তো?'

'কি, ও, না!'

'বহুৎ হারামি মেয়েছেলে। আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।'

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ সার। সকালে এক বোর্ডারের জন্যে সিগারেট কিনতে গিয়েছিলাম, ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, এই ঘরে মাঝরাতে কে এসেছে?

আমি বলে দিয়েছি, তোমার কি দরকার। যে সাহেব এসেছে তার সঙ্গে লাগতে যেও না। ঠিক বলিনি স্যার ?'

'ঠিক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' জ্যাকি চলে যাচ্ছিল। নীল তাকে থামাল। একটু ইতস্তত করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো কলকাতা শহরটা ঘুরে দেখার সুযোগ পাও না, তাই না ?'

জ্যাকি প্রতিবাদ করল, 'কেন না স্যার ? দুপুর দুটো থেকে ছটা পর্যন্ত আমার ছুটি। তখন সিনেমা দেখি, ঘুরে বেড়াই।'

'হুম।' আচ্ছা, এদিকে কোন সাদা বাড়ি দেখেছ ? আটতলা সাদা বাড়ি ?'

প্রশ্ন শুনে ছেলেটা যেভাবে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল তাতে মনে হল জলে পড়ে গেছে ! নীল হেসে বলল, 'একটু লক্ষ্য রেখো তো। আটতলা সাদা বাড়িটার মাথায় দড়িতে বড় গ্যাস বেলুন বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা আছে। ওটা উঠে গেছে আকাশে।'

জ্যাকি মাথা নাড়ল। তারপর চলে গেল।

স্নান করতে করতে নীল নিজেকে বোঝাল। এইসব করতে সে কলকাতায় আসেনি। এত বছর পরে কলকাতা এসেছে যার সঙ্গে দেখা করতে তার কথা না ভেবে সে অন্য ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, টেলিফোনে মেয়েছেলেটার কথা শুনে মনে হয়েছিল প্রচুর টাকার মাল বে-আইনিভাবে হাত বদল হচ্ছে, সে যদি মাঝখানে থেকে উড়ে গিয়ে দাঁও মেরে দেয় তাতে মন্দ কি ! কিন্তু তার বদলে জুটল কিছু ন্যাংটো ছবি আর একটা খুনের ছায়া। লোকটা নিজে যদি ধরাও দেয় তাহলে কি পুলিশকে নীলের কথা বলবে না ? একবার মনে হল নাও বলতে পারে ! পুলিশ জিজ্ঞাসা করবে কেন সে অচেনা লোককে নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে গিয়েছিল ? হঠাৎই নীলের মনে হল নিজেকে বাঁচাবার জন্যে লোকটা যেচে পুলিশের কাছে যায়নি তো ? এই ছবিগুলো হাতছাড়া করার অপরাধে ম্যাডাম তাকে যে শাস্তি দিত তার চেয়ে ঢের কম শাস্তি সে পাবে পুলিশের কাছে গেলে। হয়তো সে স্টেটমেন্ট দিয়েছে ওই রাত্রে স্ত্রীর কাছে গিয়েছিল কিন্তু খুনের আগেই চলে এসেছে। সে খুন করেছে এমন প্রমাণ না করতে পারলে ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে না। অথচ এই সময় ওর জেলের ভেতরে থাকা দরকার ম্যাডামের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। মাথা মুছতে মুছতে নীল নিজেকে বলল, 'অনেক হয়েছে, আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

পরিষ্কার জামা প্যান্ট পরে চুল আঁচড়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নীলের মনে হল দেখতে সে নেহাৎ মন্দ নয়। সে চোখ বন্ধ করতেই সেই মুখটাকে দেখতে পেল। অদ্ভুত গলায় সেই মেয়ে বলেছিল, 'তোমার দিকে তাকিয়ে আমি যে একটুও রাগতে পারছি না।' এত বছর ধরে ওই মুখ ওই স্বর সে মনে মনে লালন করে এসেছে। এবার মুখোমুখি হতে হবে। একসময়ে প্রায় ভ্যাগাবন্ড, যোগ্যতাহীন এক তরুণের সঙ্গে তার নিশ্চয়ই অনেক পার্থক্য। তখন সামনে দাঁড়িয়ে দাবীর হাত বাড়াবার ক্ষমতা ছিল না তার। আজ নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু সে কতটা বদলেছে, কোন পরিস্থিতিতে আছে, কিছুই জানা নেই। হ্যাঁ, এখন তার কোম্পানিতে ধর্মঘট চলছে, পকেটে বেশি টাকাও নেই কিন্তু ধর্মঘট তো অনন্তকাল চলতে পারে না। সবকিছু নিয়মিত হয়ে গেলে সে আর পাঁচ-জন নাবিকের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। টাকার অভাব থাকবে না কারণ এখন এক ডলার বোম্বের বাজারে বত্রিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অতএব নিশ্চয়ই পূর্ণ যোগ্যতা নিয়ে সে দশ বছর বাদে ফিরে এসেছে। নীল নিজের চিবুকটা দেখল। ভাঁজটা মরেনি, মরে যায়নি!
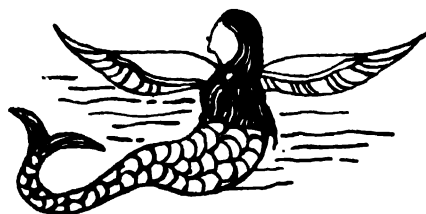
লাঞ্চ সাজিয়ে জ্যাকি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো এখানেই থাকতেন স্যার ?'

খাওয়া শুরু করে নীল হাসল, 'কে বলল ?'

'মালিক বলল আপনি এই পাড়াতেই ছিলেন, খুব দুষ্টুমি করতেন।'

নীল জবাব দিল না। ব্রেকফাস্ট না খাওয়ায় খিদেটা বেশ জমেছিল। কিন্তু দুপুরে কম খেলে শরীর সুস্থ থাকে বলেই এতেই সন্তুষ্ট হতে হচ্ছে।

'আপনি এখন বাইরে যাবেন স্যার ?'

'হ্যাঁ। একটু ঘুরে আসি।' নীল বলল, 'কাছেই আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি। ওর বাবা একসময় জকি ছিলেন. পরে ট্রেনার হয়েছিলেন। আমি যখন বাইরে যাই ও তখন সবে ঢুকেছে। চেনো নাকি ওদের ? টনি স্মিথ, ববি স্মিথ।'

জ্যাকি যেন লাফিয়ে উঠল, 'ববি স্মিথ আপনার বন্ধু স্যার ? ও এবার ক্যালকাটা ডার্বি জিতেছে ফোর টু ওয়ানে। পাড়ার কাউকে খবর দেয়নি।'

'আচ্ছা ?'

'কিন্তু ওর বাবা টনি স্মিথ অন্ধ হয়ে গেছে।'

'সেকি ! কি করে ?'

'চোখের অসুখ হয়েছিল। আপনি ওদের বাড়িতে যাবেন ?'

'হ্যাঁ, যাব।'

'একটু অপেক্ষা করুন স্যার, আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।'

'না, না। আমি নিজেই যেতে পারব। এ পাড়া তো আমার পাড়া !'

'স্যার, কালকে রেস আছে, আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবেন কোন্ ঘোড়া জিতবে ?'

'তুমি রেস খেলো নাকি ?'

'একটু একটু। পাঁচ আনা, দশ আনা।'

'উহঃ। রেস খুব খারাপ নেশা।'

কথাটা শুনেও একটুও ভাবান্তর হল না জ্যাকির। নীল বলল, 'তার চেয়ে তুমি সেই সাদা আটতলা বাড়িটাকে খুঁজে বের কর, অনেক বেশী টাকা পাবে।'

জ্যাকি মাথা নাড়ল, 'আমি আজই বন্ধুদের বলছি।'

দরজায় তালা ঝুলিয়ে নীল নিচে নামল। টোডিলাল তার কাউন্টারে বসে আছে। দেখামাত্র হাসল, 'কি, শরীর ঠিক আছে তো?'

'বিলকুল ঠিক।' নীল জবাব দিল।

'আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলাম। তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে ডাকিনি।

'কি ব্যাপার?'

'পুলিশ এসেছিল। জিজ্ঞাসা করল নতুন কোন বোর্ডার এসেছে কিনা কাল রাত্রে যাকে আমি চিনি না। আমি বলে দিয়েছি এমন কেউ আসেনি। তুমি কোন গোলমাল করে এসেছ নাকি?' শেষ প্রশ্নটা গলা নামিয়ে করল টোডিলাল।

'সোজা এলাম বোম্বে থেকে। সেরকম করার সুযোগ পেলাম কোথায়?'

'বাঃ! একটু চিন্তা হয়েছিল। এখানকার ও সি খুব খারাপ লোক।'

'তাই?'

'মনে দয়ামায়া নেই, ভদ্রতাবোধ কি জিনিস জানে না। ওকে দেখলেই ভয় হয়।'

'তুমিও তাহলে ভয় পাও টোডিলাল?'

টোডিলাল হাসল, 'বয়স হয়েছে, রক্তের জোর কমেছে, ব্যবসাটা চালাতে হবে। তা ছাড়া, এর মত অফিসার আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি। লোকটা ভাল না মন্দ আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। তুমি কাল স্টেশন থেকে এখানে চলে এসেছ, তাই তো?'

'বৃষ্টির জন্যে আটকে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, কাল জব্বর বৃষ্টি হয়েছিল। আমার ছেলেকে দেখেছ কাল?'

'বাইরের কাউন্টারে যে বসেছিল?'

'হ্যাঁ। শুধু ফিল্মে নামবে আর গায়ক হবে, বিজনেসটাই করবে না।'

'ঠিক হয়ে যাবে, বয়স বাড়লে সব ঠিক হয়ে যায়।' নীল বেরিয়ে আসার সময় রেস্টুরেন্টটাকে দেখল। চার-পাঁচজন খদ্দের আছে কিন্তু টোডিলালের

ছেলেকে দেখতে পেল না। বয়স্ক মানুষেরা কেন যে সব সময় ভাবে তরুণরাও তাদের মত চলবে।

আজ বৃষ্টি নেই। কিন্তু হালকা মেঘ আকাশে ঘুর ঘুর করছে। নীল চারপাশে তাকাল হোটেলের সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ পেছনে একটা সিটি বাজল। সে মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে কাউকে দেখতে পেল না। দ্বিতীয়-বার সিটি বাজতেই সে পেছন ফিরতেই ওপাশের দোতলার জানলা থেকে কেউ সরে গেল ঝট্ করে। নীল অবাক হল। যে গেল তাকে মেয়ে বলেই মনে হল। আশ্চর্য! আজকাল এ পাড়ায় মেয়েরা সিটি দেয় নাকি! সে হাঁটা শুরু করল।

মোড়ের মুখেই ঠাকুরের পানের দোকান। লোকটা আরও বুড়ো হয়েছে। এককালে ওর কাছ থেকে চারমিনার সিগারেট কিনত সে। একটা কি দুটো। সামনে দাঁড়ানোর পরও ঠাকুর তাকে চিনতে পারল না! সে হাসল, ঠাকুর, তুমি বুড়ো হয়ে গেছ।'

ঠাকুর অবাক হল, 'কি বলছেন ?'

'একটা চারমিনার আর এক টুকরো সুপুরি।'

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের চোখে পরিচিতির আলো জ্বলে উঠল, 'আই বাপ' চিনব কি করে ? আপনে তো এক্কেবারে সাহেব হয়ে গিয়েছেন। এতদিন কোথায় ছিলেন ?'

'জাহাজে।'

'হুঁ। আমিও তাই শুনছি। আপনার সেই বন্ধু ? অবিনাশ, সে তো মার্ডার হই গিসা। ফালতু ফালতু।' চারমিনারের প্যাকেট খুলে একটা এগিয়ে ধরল ঠাকুর।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নীল। অবিনাশ খুন হয়ে গেছে ? অদ্ভুত ব্যাপার। খুব ঠাণ্ডা ছেলে ছিল সে। খেলাধুলো, হৈচৈ এবং মারপিট থেকে বহু দূরে থাকত। নীলের সঙ্গে ওর একটু ভাব ছিল কিন্তু একটা ব্যাপারে বেশ আপত্তি ছিল। নীল যে ওর বোনের সম্পর্কে আগ্রহী তা অবিনাশ পছন্দ করত না। কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই বলত ওদের পরিবার খুবই অভিজাত, টিয়ার সঙ্গে মালদহের এক জমিদারের ছেলের সম্বন্ধ চলছে যে জমিদার নাকি এখনও হাতির পিঠে ঘুরে বেড়ান। অর্থাৎ টিয়ার সঙ্গে নীলের মত ফেকলু ছেলেকে মানায় না। রাগ হত কিন্তু মুখে কিছু বলত না নীল। সেই অবিনাশ খুন হয়ে গেল। মন খারাপ হয়ে গেল নীলের।

টনি স্মিথ বসেছিল বেশ পুরোনো ইজিচেয়ারে। ইলিয়ট রোড থেকে যেসব গলি একের পর এক রিপন স্ট্রীটে চলে গিয়েছে তার একটার দিকে মুখ করে বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে বসেছিল সে। বয়স ষাটের গায়ে কিন্তু চেহারা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। চুল প্রায় সাদা, শরীর শুকিয়ে গেছে, পরণে একটা গেঞ্জি আর খাটো প্যান্ট। পা দুটো লিকলিক করছে। নীল সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাই আঙ্কল!'

টনির মাথাটা নড়ল। এবং তখনই বোঝা গেল তার চোখে দৃষ্টি নেই। খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি চোখে দেখি না অতএব তোমার নামটা বল।'

'আমি নীল, ববির বন্ধু।'

'নীল? ঠিক প্লেস করতে পারছি না।'

এই সময় ববির দিদি বেরিয়ে এল। সেই একই রকম চেহারা। মোটাসোটা, বিরাট ম্যাক্সি শরীরে ঢোল হয়ে আছে। এসেই চিৎকার করল, 'আরে, নীল না? এতদিন কোথায় ছিলে তুমি, এ্যাঁ? কি চেহারা করেছ, একেবারে তাগড়াই জোয়ান?'

টনি স্মিথ হাত নাড়ল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ববির দিদি ইশারায় মাথা দোলাল, তারপর এগিয়ে এসে বলল, 'আমাদের ববির বন্ধু। অ্যাসেম্ব্লিতে পড়ত, মনে নেই তোমার?'

টনি স্মিথের মুখের চেহারা পাল্টালো, 'যে জাহাজে কাজ নিয়ে গিয়েছিল?'

নীল জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

'ও মাই বয়, কত বছর হয়ে গেছে, চট করে কি মনে পড়ে? আর দেখছ তো আমাকে! চোখ নেই, শরীর টলমল করছে, বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন। তবে তোমার বন্ধু খুব নাম করেছে। এবার ডার্বি জিতেছে। দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে?'

'না। আাম গতকাল এসেছি।'

'হুঁ। সবই ভাল কিন্তু ওর রাইডিং-এ একটা ডিফেক্ট আছে। ডিসট্যান্স পোস্ট থেকে নিজের শরীর যতটা সম্ভব ঘোড়ার শরীর থেকে আলাদা রাখতে হয়। একটু ঝুঁকে রাইড করলে ঘোড়া আরও বেশী জোর পায়। নাইনটিন সিক্সটি সেভেনে অ্যার লেসলি পিগট—।' কাশি এসে গেল টনির। সেটা

সামলে নিতেই তার মেয়ে গলা তুলল, 'নীল বেড়াতে এল আর তুমি সেই গল্প শোনাতে বসলে ? এই জন্যে কেউ তোমার কাছে আসতে চায় না আজকাল। কবে কে কি ভাবে হেরেছিল তা শুনে ওর কি লাভ ?'

এবার নীল জিজ্ঞাসা করল, 'ববি কোথায় ?'

টনি বলল, 'ব্যাঙ্গালোরে ছিল। আজ এয়ারপোর্টে নেমে সোজা চলে যাবে রেসকোর্সে। আমি এটাও পছন্দ করি না। আজ কলকাতা কাল ব্যাঙ্গালোর পরশু বোম্বাই ! আর এই যে সব সেণ্টারে ঘুরে রাইড করা এটা ঠিক নয়। এতে শরীর ক্লান্ত হয়, মনের জোর কমে যায়।'

নীল হতাশ হল, 'তাহলে আমি চলি।'

'যাবে মানে ? এসেই চলে যাবে ? তা হবে না। এসো ভেতরে এসো।' ববির দিদি নীলের হাত ধরে ড্রইং রুমে নিয়ে এল। ঠিক তখনই সেখানে একটি ছোটখাটো মিষ্টি মেয়ে ভেতর থেকে এল। ববির দিদি বলল, 'একে তুমি চেনো না। এর নাম জুলি, ববির বউ। জুলি, এ হচ্ছে নীল, ববির বন্ধু।'

দুজনে পরস্পরকে হাই বলল।

ববির দিদি জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবে ? কফি অথবা বিয়ার ?'

'কিছু না। আমি একটু আগে লাঞ্চ করে এসেছি।' নীল হাসল।

'জানো জুলি, নীল এখন একদম সেইলার। বিয়ে করেছ ?'

'না।'

'তা করবে কেন ? প্রত্যেক পোর্টে নিশ্চয়ই একজন করে বউ রেখে দিয়েছ। বাট বি অ্যাওয়ার অফ এইড্স। সেইলার দেখলেই আমার ভয় করে।'

'আপনার বিয়ে হয়নি ?'

'কে করবে ? এই ধুমসো চেহারা। সবাই রোগা পটকা মেয়ে খোঁজে।' ববির দিদি কথা শেষ করতেই জুলি বলল, 'ডেইজ, আমি যাচ্ছি।'

'ও সিওর। কিন্তু নীল, তুমি ববির সঙ্গে দেখা করতে চাও ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে তুমি জুলির সঙ্গে রেসকোর্সে যাও। কারণ ববি আজকের রেস শেষ করেই এয়ারপোর্টে ছুটবে বোম্বের ফ্লাইট ধরতে। জুলি যাচ্ছে ওর বরের সঙ্গে দেখা করতে।'

নীল মাথা নাড়ল, 'আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো ?'

জুলি বলল, 'মোটেই নয়। আমার গাড়িতে প্রচুর জায়গা আছে।'

চলে আসার আগে নীলকে কথা দিতে হল দু-একদিনের মধ্যেই এ বাড়িতে আসবে। ববি না থাকলেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে না। ববির দিদি কথা আদায় করে নিল।

নীল ছোট্ট মারুতি গাড়িতে জুলির পাশে বসে ছিল নীল। সুন্দর মেয়েটা চমৎকার ভঙ্গিতে গাড়িটা চালাচ্ছে। গাড়ির ভেতরটা যেভাবে সাজানো তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না ববির আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভাল। জুলি কোন কথা বলছিল না।

নীল বলল, 'দশ বছর পরে কলকাতায় এসে দেখছি অনেক বদল হয়েছে।'

জুলি জবাব দিল না।

নীল জিজ্ঞাসা করল, 'কলকাতায় ববির রেস থাকলেই আপনি যান ?'

'আমি সব সেন্টারেই ওর সঙ্গে থাকি। এবার শুধু কলকাতায় আছি।' জুলি পার্ক স্ট্রীট ছাড়িয়ে মেয়ো রোড ধরল। একটু ঘুরতে হচ্ছে কিন্তু রাস্তা ফাঁকা।

'শুনে ভাল লাগছে ববি খুব নাম করেছে।'

'ধন্যবাদ। এ বাবদ যে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয় সেটাও মনে রাখবেন।'

নীল বুঝতে পারছিল জুলি স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে না। সে চুপ করে গেল। ছুটন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে আকাশে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ নড়ে উঠল নীল। অনেক দূরে আকাশের গায়ে একটা বেলুন দুলছে। এত দূরে যে যে বেলুনের গায়ে কোন লেখা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সে জুলিকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই বেলুনটা কোন্ বাড়ি থেকে উড়ছে ?'

জুলি ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখার চেষ্টা করল, 'অদ্ভুত।'

'মানে ?'

'আমি কি ক্যালকাটা কর্পোরেশনে কাজ করি যে সব বাড়ির খবর রাখব ?'

'না, আমি জানতে চাইছিলাম বাড়িটা কোন্ অঞ্চলে ?'

'কেন ? তাতে আপনার কি লাভ হবে ?' জুলির ঠোঁটে বিদ্রূপ চলকে উঠল, 'আমার শ্বশুর অথবা ননদ আপনার মতনই অনেক কথা বলে যার কোন মানে হয় না।'

বেলুনটা মিলিয়ে গেল। এখন যদি জুলিকে সে অনুরোধ করত তাতে কোন কাজ হত না। রেসকোর্সে যে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে কেন একটা বেলুনওয়ালা বাড়ি দেখতে যাবে সময় নষ্ট করে ? কিন্তু একটা সূত্র

পাওয়া গেল। বেলুনওয়ালা বাড়ি। এখন বাড়ির রঙ সাদা হলেই হয়!

মেম্বার্স এনক্লোজারে ঢুকতে টিকিট লাগল না। জুলির কাছে যেসব টোকেন এবং কার্ড ছিল সেগুলো সাহায্য করল ভেতরে ঢুকতে। অনেকটা ফাঁকা জায়গা। মানুষজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে কথা বলছে। বাঁ দিকে বিরাট ক্লাব হাউস। অনেকেই জুলিকে দেখে হাত তুলছে। মাথা নেড়ে জুলি সেগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছে ঠিক মহারানীর মত।

ইতিমধ্যে যে কয়েকটা রেস হয়ে গেছে তা বোঝা গেল। জুলি তাকে অপেক্ষা করতে বলে চোখের আড়ালে চলে গেলে নীল চারপাশে তাকাল। এখানকার দর্শকদের পোশাক দেখলেই বোঝা যায় এরা সবাই উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। অনেক মহিলা আছেন। তাঁদের সাজগোজ চোখ টানছে।

জুলি ফিরে এল, 'ববি এখনই প্যাডকে আসবে। দয়া করে এখন কথা বলবেন না। আজকের প্রথম রাইড এই রেসে। রেসটা হয়ে গেলে ও আপনার সঙ্গে দেখা করবে।'

নীল মাথা নাড়ল। জুলি বলল, 'রেস শেষ হয়ে গেলে আপনি ওই গাছটার নিচে এসে দাঁড়াবেন। ওকে? বাই দ্য বাই, আপনি বেটিং করতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ববিকে বেট করবেন না।' জুলি চলে গেল।

কোন রেসকার্ড হাতে নেই। ববি কোন ঘোড়ায় চড়ছে? এই সময় প্যাডকে ঘোড়াদের আনা হল। ট্রেনার মালিকরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এবার জকিরা ঢুকল। জার্সি-পরা জকিদের মুখ দেখে এতকাল পরে ববিকে চেনা মুশকিল। ও খুব ফর্সা ছিল, কিন্তু ফর্সা তো অনেক জকি। জকিরা ঘোড়ায় উঠে প্যাডকে যখন একবার পাক খেল তখনই সে ববিকে চিনতে পারল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল নীল। ববি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন সে নিচু গলায় বলল, 'গুড লাক বব।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল ববি। ওর চোখে বিস্ময়। কিন্তু ঘোড়া যেহেতু দাঁড়িয়ে থাকল না তাই ওকে অন্যান্য জকিদের সঙ্গে রেসট্র্যাকের দিকে যেতে হল।

'কি বলে গেল ববি?'

কানের কাছে প্রশ্নটা শুনে নীল ফিরে দেখল এক মধ্যবয়সিনী তাকে অদূরে অদূরে মুখ করে জিজ্ঞাসা করছেন। ভদ্রমহিলা মাখনের মত ফর্সা

কিন্তু সমস্ত শরীর থেকে চর্বি যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে। প্রচুর বড়লোকের বউ নিশ্চয়ই। হঠাৎ জুলির বলা কথাগুলো মনে আসতেই নীল তাকে জানাল, 'ও বলল যে ও জিতছে না।'

'বাজে কথা বলবেন না। তিন নম্বরকে জেতানোর জন্যে ববিকে নিয়ে আসা হয়েছে।'

'তাহলে আমার কথা শুনবেন না ?

'বাট, বাট, আমি দশ হাজার টাকা তিননম্বর বেট করেছি।

'আমি দুঃখিত, কিন্তু—।'

'আপনি জানেন তিন নম্বর ড্যাম ফেবারিট।'

'হতে পারে। কিন্তু যা শুনলাম তাই বললাম।'

'আপনি ববিকে কিরকম চেনেন ? ও কাউকে খবর বলে না।'

'আমরা বাল্যবন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি।'

শোনামাত্র ভদ্রমহিলা পড়ি কি মরি করে যেদিকে ছুটলেন সেদিকে একটা কাফেটারিয়া রয়েছে। নীলের খুব মজা লাগছিল। দশ হাজার টাকা ভদ্রমহিলা অবলীলায় যদি একটা ঘোড়ার ওপর লাগাতে পারেন তাহলে তাঁর কত টাকা আছে ?

নীল গ্যালারিতে চলে এল। ঘোড়াগুলো স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। মানুষের উত্তেজনা এখন চরমে। তারপর রেস শুরু হল।

মাইকে রিলে হচ্ছিল। তিন নম্বর ঘোড়ার নাম জনপথ। জনপথ লিড করছে। বেস্ট ঘোড়ার সময়ে জনপথ তিন লেংথে এগিয়ে। জনতা চিৎকার করছে। নীল দেখল একা এগিয়ে থাকা ঘোড়াটা যেন শ্লথ হয়ে পড়ছে। ওই ঘোড়াটাকে চালাচ্ছে ববি। উইনিং পোস্টের কাছে যখন তিন নম্বর তখন পেছন থেকে এক নম্বর ঘোড়া এসে তাকে টপকে গেল। এক নম্বর জিতল তিন সেকেন্ড আগে।

এত অল্পর জন্যে হেরে গেল ববি ? আর এই হারটা হবে তা জুলি জানত ? জুলিকে কি ববি বলেছে ? মানুষ আগে থেকে বুঝতে পারে ওইভাবে শেষমুহূর্তে সে হেরে যাবেই ? অদ্ভুত ব্যাপার।

ঘোড়াগুলো এবার ফিরে যাচ্ছে। নীল আবার ফিরে এল সেই গাছতলায়। একটু বাদে হাসিমুখে জুলি কাছে এল। ববি হেরেছে আর জুলি হাসছে ?

জুলি বলল, 'এসো।'

জুলিকে অনুসরণ করল নীল। একটা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই ববি বেরিয়ে এল। এসে দু হাতে জড়িয়ে ধরল নীলকে, 'হাই, তুই অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি ?'

'জাহাজে।'

'সে তো জানি। ওঃ, কতদিন। তোর গলা শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম। তুই কতদিন আছিস ? আমাকে আজই বোম্বাই যেতে হচ্ছে। পরশু ফিরব। তখন দেখা হবে ?'

'হবে।'

'আমার বউ-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছে শুনলাম। বাড়িতে গিয়েছিলি ? গুড। বেট মি ইন দ্য নেক্সট রেস। ও কে ?'

'নেক্সট রেস ?' নীল ঠিক বুঝতে পারল না।

'হ্যাঁ। এর পরের রেসটা আমি জিতবই। কিন্তু রেস জেতার পরেও অনেক জকিকে হেরে যেতে হয় বিভিন্ন কারণে। তাই অল্পসল্প খেলাই ভাল।'

'তোর সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে কবে ?'

'বোম্বে থেকে ফিরে আসি। আছিস তো কিছুদিন ?'

'হ্যাঁ, কিছুদিন।'

'জুলিকে কেমন লাগছে ?'

'ভাল।'

'সত্যি ভাল মেয়ে ও। এখন চলি, বাই।' কেউ ডাকতেই ববি নীলের হাত ছুঁয়ে ভেতরে চলে গেল। জুলি এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। স্বামীর সঙ্গে সে নীলের সামনে একটাও কথা বলেনি। হয়তো দুই হারানো বন্ধুকে কথা বলার সুযোগ দেবার জন্যে সে চুপ করেছিল। এবার বলল, 'ববি যে ঘোড়াটা চালাচ্ছে তার নম্বর ছয়।'

নীল বলল, 'কিভাবে খেলতে হয় আমি জানি না।'

জুলি হাসল, 'চারপাশের মানুষকে লক্ষ্য করুন তাহলেই জেনে যাবেন।'

এই সময় কেউ একজন জুলিকে ডাকতেই সে রাজেন্দ্রাণীর মত তার দিকে এগিয়ে গেল। নীল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। জুয়ায় হারার বিন্দুমাত্র বাসনা তার নেই। পকেটে যা আছে তা দিয়ে ধর্মঘট শেষ হওয়া পর্যন্ত চালাতে হবে। ববিকে এতদিন পরে দেখে বেশ ভাল লাগল। ববি কি অবিনাশের ব্যাপারটা জানে ? জিজ্ঞাসা করলে হত।

নীল চারপাশে নজর বোলাতে বোলাতে বিরাট কাউন্টারের কাছে চলে এল। সেল লেখা কাউন্টারেই তাহলে টিকিট বিক্রী হচ্ছে! ওপাশে একটা ফেনসিং। তার ওধারে খুব ভীড়, আওয়াজ। ওখানে আর এক ধরনের বেটিং চলছে বলে মনে হল। ববি ছয় নম্বর ঘোড়া চালাচ্ছে যেটা সে জিতবে বলে আশা করে। কম করে কত টাকা খেলা যায়?

নীল কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে বসা এক সুন্দরীকে প্রশ্ন করতে তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'দশ টাকা।'

নীল পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বলল, 'আমাকে ছয় নম্বরের টিকিট দিন।'

মেয়েটি বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'উইন অর প্লেস?'

'উইন।'

টিকিট হাতে নিয়ে সে দেখল কম্প্যুটারে বিস্তারিত লেখা আছে তাতে। এমন কি কোন্ সময়ে টিকিটটা কাটা হয়েছে, তাও। সে অন্যমনস্ক হয়ে কাফেটেরিয়ার সামনে এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেল, 'হেল্লো, হেল্লো, হেয়ার ইউ আর।'

নীল সেই মধ্যবয়স্কাকে দেখতে পেল। মাংসল মুখে হাসি উপচে পড়ায় তাঁকে কিম্ভূত দেখাচ্ছে। নীল হাসল।

মহিলা বললেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার।'

'কেন?'

'আপনার কথা শুনে আমি আমার বেটিং মানি দুজনকে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। যেহেতু আমি বেশী প্রাইজে বাগিয়েছিলাম তাই বিক্রি করতে অসুবিধে হয়নি।' খিলখিল করে হেসে উঠলেন মহিলা। তাঁর সমস্ত শরীর নাচতে লাগল হাসির দমকে। সেটাকে সামলে তিনি বললেন, 'এখানে না দাঁড়িয়ে থেকে প্যাডকের ঢোকার মুখটায় চলুন।'

'কেন?

'একটু পরেই জকিরা ওখান দিয়ে ঘোড়া নিয়ে বের হবে।'

'তাতে কি?'

'আঃ, ববি স্মিথকে জিজ্ঞাসা করবেন এবার জেতার চান্স আছে কিনা?'

'আপনার কি মনে হয়?'

'খুব কম। তিন নম্বর হট ফেবারিট।' মহিলার কথা শেষ হওয়ামাত্র একটি

কিশোরী গম্ভীর মুখে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল, 'মাম্, তোমার বিয়ার গরম হয়ে যাচ্ছে।'

মহিলা ছোট্ট মেয়ের মত চোখ তুললেন, 'ও, নিশ্চয়। মিট দিস জেন্টলম্যান, ইনি আমার দশ হাজার বাঁচিয়ে দিয়েছেন। হাউ অ্যাবাউট এ গ্লাস অফ বিয়ার?'

নীল কিশোরীকে দেখছিল। অসম্ভব। এ হতে পারে না। কিন্তু এর তাকানো, মুখের গড়ন দেখে সে চমকে উঠেছিল। প্রশ্নটা শুনে মনে হল একটু গলা ভেজালে মন্দ হয় না। সে মাথা নেড়ে অনুসরণ করল। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কাফেটারিয়ার কোণে সম্ভ্রান্ত চেহারার এক বৃদ্ধ বসে আছেন। মহিলা তাঁর সামনের চেয়ারটি টেনে নিয়ে নীলকে বসতে বললেন। পরিচয় হল। ভদ্রলোক চামড়াজাত জিনিস রপ্তানি করেন। এই মহিলার স্বামী। খুব ধীরে কথা বলেন। বললেন, 'রেসকোর্সে আমার আসার সময় হয় না। ব্যবসার জন্যে ব্যস্ত থাকি।'

মহিলা অনুযোগ করলেন, 'হি ইজ অলওয়েজ আফটার মানি!'

বৃদ্ধ বললেন, 'কে নয়? তুমি এখানে আস কেন? একটু আগে দশ হাজার খেলে এসে বললে সিওর জিতছ। খানিক পরেই কার্ডগুলো বিক্রী করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে।'

বিয়ার এল। এক চুমুকে অনেকটা খেয়ে নীল দেখল মহিলা দেওয়ালে ঝোলানো টিভি সেটটার দিকে তাকিয়ে আছেন। সেখানে প্যাডকের ছবি। জকিহীন ঘোড়াগুলো দর্শকদের দেখাচ্ছে সহিসরা। মহিলা বিড়বিড় করলেন, 'তিন নম্বর জিতবে।'

বৃদ্ধ নীলের দিকে তাকালেন। নীল নীরবে না বলল মাথা নেড়ে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে?'

'ছয়। হর্স নাম্বার সিক্স।'

বৃদ্ধ উঠলেন, 'এক্সকিউজ মি' বলে কাফেটারিয়া থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মহিলা জিজ্ঞাসা করলো, 'কি বললো ও?'

নীল জবাব দিল, 'বললেন এক্সকিউজ মি।'

মহিলা রাগত ভঙ্গী নিয়ে উঠে দাঁড়াতে কিশোরী বলল, 'মাম্, আমি একশ বেট করব।'

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ ঘোড়া?'

নীল চটপট বলল, 'নাম্বার সিক্স।'

কিশোরী কাঁধ ঝাঁকালেন, 'ওকে, দেন সিক্স।'

'হউ আর অল ক্রেজি।' মহিলা কিশোরীর হাত থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কিশোরী এবার হাসল, 'মা আপনাকে বিশ্বাস করছে না।'

নীল বিয়ারে চুমুক দিল, 'সেটাই স্বাভাবিক।'

'আপনি রোজ আসেন?' কিশোরী ঘাড় বেঁকালো।

'এই প্রথম। আমি বাইরে থাকি।'

'কোথায়?'

'সমুদ্রে। জাহাজে চাকরি করি।'

'অ্যাঁ! দারুণ ব্যাপার। আপনার লাইফ খুব অ্যাডভেঞ্চারাস, না?

'একটু-আধটু।'

'আমি সেইলার্সদের নিয়ে দুটো উপন্যাস পড়েছি।'

'ও। কি পড় তুমি?'

'আই অ্যাম ইন ক্লাস টুয়েলভ। আমার নাম প্রাণ।'

'আচ্ছা!'

'আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছেন?'

'প্রায় সমস্ত পৃথিবী।'

'ওঃ, আপনাকে আমার খুব হিংসে হচ্ছে।'

ঘোড়াগুলো রেস ট্রাকে চলে গিয়েছে। টিভিতে দেখাচ্ছিল ওদের। এই সময় বৃদ্ধ ফিরে এলেন, 'আপনার ছয় নম্বর ঘোড়ার প্রাইজ থ্রি টু ওয়ান।'

নীল মাথা নাড়ল।

প্রৌঢ় নিজের চেয়ারে বসে বললেন, 'আমি এখানে এলে সাধারণত বসেই থাকি। কিন্তু এবার ঝুঁকি নিলাম।'

'বুঝলাম না।'

'ভাল ব্যবসায়ী ঠিক সময়ে সাফল্যের গন্ধ পায়। আমার মনে হল আমি পেয়েছি।'

নীলের অস্বস্তি হল। যদি ববি না জেতে? সে গম্ভীর মুখে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকল। রেস শুরু হতে মিনিটখানেক বাকি। হঠাৎ বেটিং বোর্ড দেখা গেল টিভিতে: ঘোষক জানালেন শেষ মুহূর্তে বেটিং-এর বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এতক্ষণ হট ফেবারিট হয়ে থাকা তিন নম্বরের প্রাইজ বেড়ে

গেছে। আর ছয় নম্বর ঘোড়া ইভন মানি হয়েছে।

রেস শুরু হল। নীল ববিকে দেখতে পাচ্ছিল। তার ঘোড়া দু নম্বরে রেখেছে সে। বাঁক ঘোড়ামাত্র পাশ কাটিয়ে সে প্রথমে চলে এল। তারপর তীরের বেগে চারশো মিটার ছুটে উইনিং পোস্ট পেরিয়ে গেল।

হঠাৎ বৃদ্ধ নীলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'ধন্যবাদ।'

নীল বোকার মত করমর্দন করল। কিশোরী তখন চেঁচাচ্ছে, 'নাম্বার সিক্স ওন দ্য রেস।' নীল বোকার মত তাকাল।

বৃদ্ধ বলল, 'নাউ আই উইল টেল ইউ। হঠাৎ কি মনে হল রিং-এ গিয়ে কুড়ি হাজার বেট করে দিলাম ছয় নম্বর ঘোড়ায়। ট্যাক্স কেটে হাতে পাবো সাতাশি হাজার। আমি এবারও সঠিক কাজটা করলাম।'

'মাম্, মাম্ কোথায়?' কিশোরী ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'সে নির্ঘাৎ হেরে গিয়েছে।' বৃদ্ধ খুশী মুখে মন্তব্য করলেন।

'এক্সকিউজ মি', বলে উঠে দাঁড়াল নীল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কত খেলেছেন?'

'দশ টাকা।'

'মানে?' চমকে উঠলেন বৃদ্ধ।

'আমার ইচ্ছে হয়নি।'

'সেকি? অথচ আপনার কথার ওপর বিশ্বাস করে আমরা এতগুলো টাকা খেললাম!'

'বিশ্বাস করে ঠকেননি!'

'নো।' বৃদ্ধ নীলের হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'তুমি যা বলছ তা সত্যি?'

নীল পকেট থেকে দশটাকার টিকিট বের করে বৃদ্ধকে দেখাল।

'তোমার সঙ্গে টাকা ছিল না?'

'ছিল।'

'তবু নিজে খেলোনি?' বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন, 'বড় ধাক্কা দিলে হে। তোমার মত ইয়ং ছেলের লোভ নেই আর আমি বুড়ো বয়সেও টাকার পেছনে ছুটে যাচ্ছি। আমার যা আছে এরা দুইবোন যদি দুহাতে উড়িয়ে না দেয় তো এদের নাতিরা পায়ের ওপর পা তুলে ভাল থাকবে। অথচ আমি আরও চাইছি, কার জন্যে?'

কিশোরী উঠল, 'আমি মামকে খুঁজে আনছি।'

সে চলে যেতে বৃদ্ধ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন। নীল শুনেছিল শ্মশানে গেলে অনেকের মনে বৈরাগ্য আসে। কিন্তু রেসের মাঠেও যে সেটা আসতে পারে তা জানত না। সে আবার চেয়ারে বসল, 'আপনি এত গভীর ভাবে ব্যাপারটা ভাববেন না।'

'নাহে, আমি খুব ধাক্কা খেয়েছি। এক কাজ কর, আমার কার্ডগুলো নিয়ে যাও। বুকির কাছে গিয়ে ওগুলোকে ক্যাশ করে আমার বেটিং মানি আমাকে ফেরৎ দিয়ে বাকিটা তুমি নিয়ে নাও।'

'বাকিটা মানে জেতার টাকাটা ? সে তো অনেক !' নীল অবাক।

'কিন্তু ওটা আমার পাওয়ার কথা ছিল না।'

'আপনি ভুল করছেন। যে টাকাটা হার থেকে বেঁচে যায় বেট না করে সেটাও যেমন জেতার টাকার মতনই তেমনই জিততে গেলেও টাকার দরকার হয়। আপনার ছিল আমার নেই।'

'এই যে বললে তোমার সঙ্গে টাকা আছে।'

'আছে। কিন্তু কত ? আমি জাহাজে চাকরি করি। কোম্পানিতে ধর্মঘট চলছে বলে কলকাতায় এসেছি। এই অবস্থায় আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'আচ্ছা ! কোন্ কোম্পানিতে কাজ কর তুমি ?'

নীল বৃদ্ধকে কোম্পানির নামটা জানাতেই তিনি নড়েচড়ে বসলেন, 'এটা তো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কোম্পানি। আমাদের জাভেজার ওখানে খুব ইনফ্লুয়েন্স আছে। লেট্স গো, পেমেন্ট নিয়ে আসা যাক।'

বৃদ্ধ বেয়ারাকে ডেকে ড্রিংকসের দাম মিটিয়ে নীলের পাশে হাঁটতে লাগলেন, 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু মাই বয়, শুধু জলে ভেসে থাকলে জীবনের পায়ের তলায় কি কখনও শক্ত মাটি আসবে ?'

'সবাই কি শক্ত মাটি চায় ?'

'এখন বুঝবে না। আর একটু বয়স হোক তখন অনুভব করবে। আজ সন্ধ্যায় তুমি যদি খুব ব্যস্ত না থাকো তাহলে এই বুড়োর সঙ্গে বসে দুটো হুইস্কি খেয়ে যাও।'

'আমার সৌভাগ্য।'

বৃদ্ধ পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিতেই আর একজন প্রবীণ এগিয়ে এলেন, 'হ্যালো মিস্টার যোশী, হাউ ইজ দ্য লাক।'

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'নট ব্যাড। ছয় নম্বর খেলেছিলাম।'

'ও, কিন্তু ঘোড়াটার কোন প্রাইজ ছিল না।'

'আমি প্রথমেই খেলেছিলাম, থি্রু টু ওয়ান।'

'ওঃ, আপনি সত্যি লাকি। ঈশ্বর সবসময় আপনার সঙ্গে আছেন।'

বৃদ্ধ হাসতে হাসতে ভদ্রলোকের সঙ্গে এগিয়ে চললেন। নীল কার্ডটা দেখল। বেশ দামী কার্ড। এ কে যোশী। ঠিকানাটা পড়ল সে। থিয়েটার রোডের কাছাকাছি হবে। বৃদ্ধের মনে যে শ্মশানবৈরাগ্য এসেছিল তা ইতিমধ্যেই দূর হয়ে গেছে।

দশ টাকায় মাত্র আঠারো টাকা পাওয়া গেল। আর ভাল লাগছিল না নীলের। সে মেম্বার্স এনক্লোজার থেকে হাঁটতে হাঁটতে বুকিদের রিঙ-এ চলে এল। প্রচণ্ড ভিড়। পরের রেসে বেট করার জন্যে কলকাতার কিছু মানুষ মরীয়া হয়ে টাকা দিচ্ছে বুকিদের হাতে। খসখস করে কার্ড লিখে তারা টাকা নিচ্ছে। মানুষের কত টাকা!

হঠাৎ চোখে পড়ল। রেসের হলুদ মলাটের বইটা চোখের সামনে ধরে লোকটা মগ্ন হয়ে দেখছে। নীল আড়ষ্ট হল। চোখাচোখি হলেই চিনতে পারবে নির্ঘাৎ। ড্রিমল্যান্ড রেস্টরেন্টের আলো-আঁধারিতে দেখলেও এরা চট করে কাউকে ভুলে যায় না। নীল একটা আড়াল খুঁজে নিয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করছিল। এবং সে আবিষ্কার করল বইটা চোখের সামনে ধরে রেখেছে বটে কিন্তু লোকটা দেখছে ডান দিকে। ডান দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে মিসেস যোশী এবং তাঁর মেয়ে সাহেব চেহারার একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। কথা শেষ করে মিসেস যোশীরা বেটিং রিঙ-এর দিকে এগিয়ে আসতেই লোকটা এঁদের অনুসরণ করল। এবং এই ভঙ্গীতে ওর পেশাদারী ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হল! এই লোকটিকে ম্যাডাম নামক মহিলা কাজের জন্য নির্বাচন করেছেন, তাঁর বুদ্ধির নিশ্চয়ই তারিফ করতে হয়। এবার ওর এক হাতে জ্বলন্ত চুরুট দেখতে পেল নীল!

মিসেস যোশীর হাতের মুঠোয় টাকা। একটা বুকির বুথের সামনে পৌঁছবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ভিড় ঠেলে। শেষে না পেরে পেছন দিকে চলে গেলেন। কিশোরী অবাক চোখে এসব দেখছিল। নীল দেখল লোকটি কিশোরীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হেসে কিছু বলল। কিন্তু সেটা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে কিশোরী এক পা সরে দাঁড়াল।

মিসেস যোশী বিনীত ভঙ্গীতে হেসে বুকির কাছ থেকে নিজের বেটিং কার্ড নিয়ে মেয়ের পাশে চলে এলেন। এবার ওঁরা হাঁটতে লাগলেন। মেম্বার্স এনক্লোজারের দিকে। গেট পেরিয়ে চলে গেলেন ওপাশে। লোকটি ওঁদের অনুসরণ করে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। গেটের পাশে টুলে বসা একটা লোক তখন হাত বাড়িয়ে কিছু চাইছে ওর কাছে। লোকটা নিজের মনে মাথা নেড়ে ফিরে এল। অর্থাৎ এখন ওপাশে যেতে গেলে কিছু দেখাতে হবে যা ওই লোকটার কাছে নেই। মেম্বার্স এনক্লোজারে ঢোকার সময় জুলি তার হয়ে কার্ড দেখিয়েছিল এবং সেটা ওর কাছেই রয়ে গেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে এখানে আসার সময় কেউ বাধা দেয়নি কিন্তু ফিরতে গেলেই যে দেবে তা বোঝা যাচ্ছে। তার মানে সে ইচ্ছে করলেও জুলির সঙ্গে ফিরতে পারবে না। অবশ্য জুলি তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তাতে যে প্রফুল্ল মনে যাওয়ার সময় লিফ্‌ট দেবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই।

একটা ঠাণ্ডা পানীয় গলায় ঢেলে দাম দিল লোকটা। তারপর রেসের বইটা দোকানদারকে দিয়ে হঠাৎই হাঁটতে শুরু করল। নীল ওকে অনুসরণ করতে দেখল লোকটা রেসমাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এখনও রেস শেষ হয়নি বলেই বাইরেটা বিস্তর ফাঁকা। শুধু কয়েকটা ট্যাক্সি রেস শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। লোকটা তার একটার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ দরাদরি করে ট্রাম লাইনের দিকে হাঁটতে লাগল।

গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে নীল লোকটিকে চলে যেতে দেখছিল। তার মনে হচ্ছিল ওকে বোকা ভাবার কোন কারণ নেই। কেউ ওকে অনুসরণ করবে না এমন ভাবার কোন কারণ নেই এবং এই লোকটি মোটেই অসতর্ক নয়। সেক্ষেত্রে ওর পেছনে যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অথচ—। নীল বুঝতে পারছিল একে অনুসরণ করলে সে হয়তো ম্যাডামের ডেরায় পৌঁছাতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ কি? ম্যাডামকে সেই ছবিগুলো বিক্রী করলে তিনি নিশ্চয়ই কিনবেন। কিন্তু কোন্‌ দামে?

তার চেয়ে এসব ঝামেলা থেকে দূরে থাকাই ভাল। যার ছবি তাকে পেলে না হয় কিছু একটা করা যেত। যেজন্যে এসেছে কলকাতায় সেটাই মন দিয়ে করা যাক, নিজেকে বোঝাল সে। লোকটি ততক্ষণে চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে।

এখন বিকেল। গালিব বারের সামনে পকেটে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল নীল। ওর উল্টো ফুটপাথ থেকে যে গলিটা পার্কস্ট্রীটের দিকে গিয়েছে সেখানে তাকে যেতে হবে। অবিনাশ নেই। অত ঠাণ্ডা খুঁতখুঁতে ছেলেটা খুন হয়ে গেছে। বাড়িতে এখন কে আছে? সেই বিশ্রী ব্যবহার করা বাবা? অবিনাশের মাও খুব খাণ্ডারনী ছিল।

অবিনাশের মা! কেন, সে আর একজনের কথা ভাবছে না? অবিনাশের বাবা মা তো তারও। নীল ধীরে ধীরে এগোল। একবার ভাবল রিক্সা নিলে কেমন হয়। ওরা যদি খারাপ ব্যবহার করে তাহলে দ্রুত চলে আসা যাবে। তারপরেই মত পাল্টালো। দশ বছর পরে খারাপ ব্যবহার করলে সে যুক্তি দেখাতে বলবে যা দশ বছর আগে পারা সম্ভব ছিল না।

এই গলি দিয়ে সে কতবার হাঁটাহাঁটি করেছে একসময়। বন্ধুদের কারো সাইকেল চেয়ে নিয়ে চার-পাঁচবার পাক খেয়েছে। একটুও বদলায়নি গলিটা। হাঁটতে হাঁটতে নীল বাঁকের মুখে চলে এল। রঙচটা বাড়িটার মাথার ওপর অনেকগুলো অ্যান্টেনা উঁচিয়ে আছে। এই বাড়ি। মাঝে মাঝে দু;-একটা রিক্সা ছাড়া এখন তেমন কাউকে চোখে পড়ছে না রাস্তায়। সে সোজা ওপরে উঠে এল। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠলেই ডান হাতি ওদের দরজা।

বেলের বোতাম নেই, নীল কড়া নাড়ল। দ্বিতীয়বারে সাড়া পাওয়া যেতেই নীলের হাত পকেট থেকে রুমাল টেনে নিয়ে দ্রুত মুখ মুছল।

দরজাটা যিনি খুললেন তিনি অবিনাশের মা। রোগা মহিলাটি আরও রোগা হয়ে গিয়েছেন। নীলের মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করছেন।

নীল হাসল, 'কেমন আছেন? আমি নীল।'

সঙ্গে সঙ্গে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন মহিলা, 'এতদিন কোথায় ছিলে? সেই এলে তো আগে এলে না কেন?'

নীল খুব ঘাবড়ে গেল, 'কি হয়েছে? আপনি এরকম করছেন কেন?'

'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।' ভদ্রমহিলা টেনেটেনে কাঁদছিলেন।

নীল বুঝল পুত্রশোক এঁকে দিশেহারা করে দিয়েছে। সে ভেতরে ঢুকল। এই ঘরে সে অনেকবার এসেছে অবিনাশের সঙ্গে। ঘরের চেহারা পাল্টায়নি।

ভদ্রমহিলা এবার একটু সামলে নিয়েছেন, আঁচলে মুখ চোখ মুছছিলেন। নীল বলল, 'এতদিন আমি বাইরে ছিলাম। গতরাত্রে ফিরেছি। আজ সকালে খবরটা শুনলাম।'

'কি শুনেছ?

'অবিনাশের ব্যাপারটা।'

মহিলা একটু চুপ করে থেকে জানতে চাইলেন, 'আর কিছু শোনোনি?'

'না তো!' নীল অবাক হল।

'কেন সে খুন হয়েছে জানো না?'

'না।'

'ওর বোনের জন্যে নিজের প্রাণ দিয়েছে। অথচ কি লাভ হল, কিস্যু না।'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'এসো আমার সঙ্গে। এঘরে এসো।' খপ করে হাত ধরে টানতে টানতে তিনি নিয়ে এলেন পাশের ঘরে। এই প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসা সময়টায় ঘরজুড়ে অন্ধকার। প্রতিটি জানলা বন্ধ। ঘরের এককোণ থেকে গলা ভেসে এল, 'কে মা?'

মহিলা তখনও নীলের হাত ধরে রেখেছিলেন। ওই অন্ধকারে কোন কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না নীল। কিন্তু গলার স্বর শুনে শিহরিত হল। লক্ষ বছর চলে গেলেও ওই স্বর সে ভুলতে পারবে না।

মহিলা বললেন, 'ও আলো জ্বালতে দেবে না। গত চারবছর ধরে এই ঘরে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে, কোন মানুষের মুখ দ্যাখে না। ওই খাট আর পাশের বাথরুমের মধ্যেই যেটুকু হাঁটাচলা। কেন জানো?'

এবার প্রশ্নটি জোরে এল, 'মা, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?'

মহিলা বলেই চলেছেন, 'ওরা ওকে অ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। সাত-মাস হাসপাতালে ছিল। কেন যে মারল না ভগবান জানেন। ফিরে এল সর্বাঙ্গ নষ্ট করে, চোখদুটো পর্যন্ত গলে গিয়েছিল। এখন আমার মেয়ে একটা মাংসের পিণ্ড, কোনমতে হাঁটতে পারে, এই যা। যারা ওর চরম ক্ষতি করেছিল খোকা তাদের ওপর বদলা নিতে গিয়ে নিজেই খুন হল। খুনীরা ধরা পড়েছে,

কিন্তু তাতে আমার কি লাভ !' আবার কান্না বাজল মহিলার গলায়। নীলের গলায় যেন কোন স্বর ছিল না। পৃথিবীটা হঠাৎই টলে উঠল তার পায়ের তলায়।

নীল কোনরকমে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন উপায় নেই ?'

'কিসের ? সেরে ওঠার ? না নেই। চোখ ও কোনভাবেই ফিরে পাবে না। শুধু প্ল্যাস্টিক-সার্জারি করে চেহারাটা ভদ্র করা যায়। কিন্তু তার খরচ অনেক। ওকে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনতে তোমার মেসোমশাই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন।' মহিলা নিঃশ্বাস ফেললেন।

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না মা ?'

'নীল। নীল এসেছে এতদিন পরে। তুমি ইচ্ছে করলে এখানে বসতে পারো।' একটা চেয়ার টেনে এনে সামনে রেখে মহিলা চলে গেলেন অন্যঘরে।

নীল বসল না। সময় যেন অচল এখন। হঠাৎ আবছা আঁধার থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'তুমি কেন এলে ? কেন ?'

নীল জবাব দিতে পারল না।

হাসি ভেসে এল, 'একসময় যাকে চেয়েছিলে সে আজ মরে গেছে।'

নীল নিঃশ্বাস ফেলল।

'তখন সবাই আমাদের মধ্যে দেওয়াল তুলেছিল।'

'আমার যোগ্যতা ছিল না।' নীল কোনমতে বলতে পারল।

'এখন আমাদের একঘরে রেখে মা যেতে পারল। কেন ? না, আমি এখন একটা মাংসের পিণ্ড। আমাকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই, ভয় নেই।' একটা অদ্ভুত হাসি বাজল, 'কিন্তু তুমি কেন এলে ? কেউ বলেনি তোমায় একথা ?'

'না।'

'জানলে আসতে না। সেটাই ভাল হত।'

'তোমাকে এখন ডাক্তার দেখছে ?'

'কি লাভ ? তাছাড়া পয়সা কোথায় ?'

'কারা তোমার এমন ক্ষতি করল ?'

'এ পাড়ার কয়েকটা মাস্তান। ওরা আমাকে ওদের হয়ে রোজগার করতে বলেছিল। আমি রাজী হইনি। পুলিশকে বলব ভেবেছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম দাদা—।' কেঁদে ফেলল সে, 'আমি কেন ফিরে এলাম ?'

নীল কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই সময়ে কী বলা যায় ? মিনিট

তিনেক চুপচাপ কেটে যাওয়ার পর প্রশ্ন এল, 'বউ নিয়ে এসেছ ?'

'মানে ?'

'বিয়ে করোনি ?'

'কি ভাবো তুমি আমাকে ?'

'কেন ? তোমার তো কোন দায় ছিল না। বিয়ে করোনি কেন ?'

'তুমি অবান্তর কথা বলছ।'

'তা তো বলবেই। যে মানুষ মানুষ নয় তার সম্পর্কে ভাল কথা আসে না।'

'তুমি মিছিমিছি রাগ করছ।'

'নিশ্চয়ই করব। দয়া দেখাতে এলে কেন ?'

'তুমি এককালে বলতে আমার ওপর রাগতে পার না।'

'এককালে। যখন তোমাকে দেখতে পেতাম।'

'আমি এসেছি তোমার ভাল লাগছে না ?'

'না। কেউ আমাকে করুণা করলে আমি— ।'

'আমি না জেনে এসেছি।'

'ও, এবার চলে যাও। জেনেছ যখন তখন আর তো আসবে না।'

'আশ্চর্য ! যা বলছি তা থেকেই একটা মানে তৈরি করছ নিজের মত !'

'দ্যাখো, আমি এখন একটা জড়ভারত, মাংসপিণ্ড, নারী নই। আমার কাছে তুমি এখন কিছুই পেতে পার না। এখান থেকে বেরিয়ে গেলে সত্যিটা বুঝতে পারবে।'

'অনেক ধন্যবাদ। বেরুবার আগেই বুঝিয়ে দিচ্ছ বলে।'

'মানে ?'

'আমি তোমার চিকিৎসা করাতে চাই।'

'কেন ?

'তোমাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনব বলে।'

'কিন্তু দৃষ্টিশক্তি আমি কখনই ফিরে পাব না।'

'খারাপ লাগছে, কিন্তু ওটুকু মেনে নেব।'

'প্রচুর খরচ।'

'জানি।'

'কিন্তু কেন করবে ?'

'এই প্রশ্নের জবাব যদি না দিই ?'

হঠাৎ কান্নার শব্দ বাজল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। নীল এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়াতে কিছুর স্পর্শ পেল। এটা যে মাথা এবং সেখানে কালো কাপড় জড়ানো তা বুঝতে সময় লাগল একটু।

'আমি এতদিন আলো জ্বালিনি। এঘরের বাল্ব খুলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তুমি ওই জানলাটা একটু খুলে দাও। বাইরে যদি আলো থাকে তাহলে আমাকে দ্যাখো। তারপরও যদি ইচ্ছে হয় তাহলেই এমন স্বপ্ন দেখিও।'

নীল হাসল, 'বাইরের আলোয় মানুষ দ্যাখে পরিচয়ের সময়, তোমার সঙ্গে আমার আজ প্রথম পরিচয় হচ্ছে না। কোন্ ডাক্তার তোমায় দেখছিল ? আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'মা জানে। আমার ওসব ভাল লাগত না।'

'আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলছি। তুমি একটু রেস্ট নাও।' নীল ধীরে ধীরে বসার ঘরে চলে এল। সেখানে মহিলা পাথরের মত দাঁড়িয়েছিলেন।

নীল বলল, 'যে ডাক্তার ওকে দেখছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই!'

ভদ্রমহিলা অবাক গলায় বললেন, 'তুমি কি বলছ তা জানো ?

'হ্যাঁ।'

'এতে কত খরচ হবে ভাবতে পারছ ?'

'ওসব নিয়ে আমি ভাবছি না। ওকে যতটা সম্ভব আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে হবে।'

'বেশ। তোমার মধ্যে এতখানি মহানুভবতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি সব কাগজপত্র দেব, তোমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাব। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারছি না, তুমি কেন এটা করছ ?' প্রশ্নটা সরাসরি করে ফেললেন মহিলা।

নীল মাথা নাড়ল, 'উত্তরটা আমিও ঠিক জানি না। আমি আগামীকাল আসব, আপনি তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে সময় ঠিক করে রাখবেন।'

সে দরজার কাছে ফিরে গেল। অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আসছি। কাল আসব। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'এসো।' অন্ধকার থেকে ছোট্ট শব্দটা ভেসে এল।
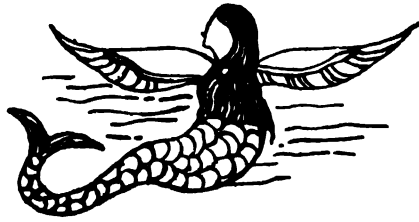
ইলিয়ট রোড ধরে হন্‌হন্‌ করে হাঁটছে নীল। তার মাথার ভেতরটা যেন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। সে যদি কলকাতায় না আসত তাহলে ব্যাপারটা অজানাই থেকে যেত। বাকী জীবন মনে মনে এক সুন্দরীকে সে কল্পনা করে যেতে পারত নিজের মতন করে। কিন্তু তা কি সত্যি হত? তাকে একবার কলকাতায় আসতেই হত ও কেমন আছে দেখার জন্যে। হয়তো তখন অনেক দেরি হয়ে যেত।

কিন্তু ওকে স্বাভাবিক চেহারায় ফিরিয়েই আনতে হবে। যে করেই হোক। তার জন্যে অনেক টাকা লাগবে। কলকাতায় সম্ভব না হলে দিল্লী বম্বেতে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেই টাকা সে কোথায় পাবে? নিজের পকেটের অবস্থা তার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। অথচ ওই মুহূর্তে মনে হয়েছিল যদি সমুদ্রকে দু'হাতে আগলালে ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তবে সে তাই করবে! কোম্পানীতে যে ধর্মঘট চলছে তা মিটে গেলে অনেকটা কৃচ্ছ্রসাধন করলে ভালই টাকা জমানো যায়। কিন্তু তার পরিমাণ আর চিকিৎসার খরচের ব্যবধান কি হবে তাই তার জানা নেই।

নীল দাঁড়াল। একবার মনে হল আজ আবেগের মাথায় অতবড় অঙ্গীকার না করলেই ভাল হত। পরে নিজের অবস্থা বুঝে ধীরে সুস্থে না হয় এগিয়ে যাওয়া যেত। কথাটা ভাবতেই নিজেকে কিরকম স্বার্থপর মনে হতে লাগল। বিয়ের পরেও অমন ঘটনা ঘটতে পারত। তাহলে কি সে তার স্ত্রীকে ওইভাবে অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখতে পারত? আজ খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর মাকে কথা শোনাতে—'সেদিন যদি ওরা রাজী হত তাহলে জীবনটাই অন্যরকম হয়ে যেত।' কিন্তু না, পোস্টমর্টেম করার কোন মানে হয় না। তাকে টাকা জোগাড় করতেই হবে। যেভাবেই হোক। লক্ষ লক্ষ টাকা। অন্তত যে টাকা খরচ করলে চিকিৎসাবিজ্ঞান একটি শরীরকে তার আগের চেহারায় ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কিভাবে? হঠাৎ ববির কথা মনে পড়ল। বম্বে থেকে ববি ফিরলে সে দেখা

করবে। বলবে, তুই আমাকে কয়েকটা ঘোড়ার নম্বর বল যারা জিতবেই। কিন্তু তার মনে হল ববি যদি সবসময় ঠিক বলতে পারে তাহলে সে নিজে এতদিনে ভারতবর্ষের এক নম্বর বড়লোক হয়ে যেতে পারত। ববির বাবা টনিকে ওই ভাবে দিন কাটাতে হত না। না, সে কোনরকম ঝুঁকি নিতে পারে না। হঠাৎ খুব মদ খেতে ইচ্ছে করছিল নীলের।

আজকাল এরকমটা হয়। যখনই সে কোন টেনশনে পড়ে তখনই একধরনের অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়। শরীরের নার্ভগুলো সেই চাপ সহ্য করতে পারে না যেন। সেইসময় একটু অ্যালকোহল অনেকটা সাহায্য করে। নীল চারপাশে তাকাল। অনেক দূরে বিখ্যাত একটা বারের নিওন লাইট দেখা যাচ্ছে। বার মানে মদ, বার মানে মেয়েছেলে, ক্যাবারে ড্যান্স। আর ক্যাবারে ড্যান্সের কথা মনে আসতেই বিদেশে দেখা নগ্ননৃত্যের দৃশ্য চোখের ওপর চলে আসতেই গতরাত্রের ছবিগুলো স্পষ্ট হল। সেই ছবিগুলো। সুন্দরী একটি তরুণীর নগ্নদৃশ্যের ছবি। ম্যাডামকে খুঁজে বের করে সে যদি টাকা চায় তাহলে কি সমস্যার সমাধান হবে? কিন্তু ম্যাডামকে সে খুঁজবে কোথায়? আজ রেস কোর্সে ওই লোকটার পেছনে গেলে হয়তো হদিশ পাওয়া যেত।

খানিকক্ষণ দোনামনা করল সে। এখন সন্ধ্যে ঘন হয়েছে কলকাতায়। ইলিয়ট রোডে রিক্সার সংখ্যা বেড়েছে। হঠাৎ মিস্টার যোশীর কথা মনে পড়ল নীলের। বৃদ্ধ তাকে আজ সন্ধ্যায় দুপাত্র হুইস্কি খেতে নেমন্তন্ন করেছে। মদ খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে যখন তখন ওখানেই যাওয়া যেতে পারে। খরচ হবে না, এখন প্রতিটি পয়সাই তার কাছে মূল্যবান।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর কোন ট্যাক্সিওয়ালাকে অল্পদূরত্বের থিয়েটার রোডে যেতে রাজী না করাতে পেরে রিক্সা নিল নীল। রিক্সাওয়ালা এ-গলি সে-গলি দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। শরীরে বাতাস লাগছে। অন্য ধরনের আরাম পেল নীল। আকাশের দিকে তাকাল সে। আর তাকানোমাত্র সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল। অনেক উঁচুতে একটা বিরাট গ্যাসবেলুন উড়ছে। এই কি সেই বেলুন? এতবড় কলকাতা শহরে কি একটা বাড়ি থেকেই বেলুন উড়বে? কিন্তু বেলুন উড়ছে এটা সত্যি কথা। আবার বেলুনটা আজই ওড়ানো হতে পারে। ছবি তোলা হয়েছিল অবশ্যই গত পরশুতে। কাল বৃষ্টি ছিল, ছাদে ছবি তোলা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ছবিতে আকাশের অবস্থাও ভাল দেখা গেছে। তার মানে গত পরশু থেকে দু-চারদিনের মধ্যে ছবি তোলা হয়েছে। আচ্ছা এমন

হতে পারে, ছবিগুলো অনেক অনেক আগে তোলা হয়েছিল, এতদিনে ম্যাডাম ওর সন্ধান পেয়েছে।

ছুটন্ত রিক্সায় বসে নীল আকাশে ভেসে থাকা বেলুনটা দেখল। রিক্সা যত এগিয়ে চলেছে বেলুন তত স্পষ্ট হচ্ছে। থিয়েটার রোডে পেঁছে সে বেলুনের দড়িটাকে দেখতে পেল। হয়তো নয় কিন্তু হতেও পারে। বেলুনটা একটা সাদা বাড়ির ছাদে ছিল। সেই ছাদের কাছাকাছি একটু নিচু একটা বাড়ির ছাদে ওই ছবি তোলা হয়েছিল।

সে রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল এই চত্বরে কোন সাদা আট নয় তলা বাড়ি আছে কি না? রিক্সাওয়ালা মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ আছে, থিয়েটার রোড লাউডন স্ট্রিটের মোড়ের কাছেই বাড়িটা। নীল সেদিকেই যেতে বলল লোকটাকে।

রিক্সাওয়ালা থামলে নীল নিচে নেমে দাঁড়াল। এক দুই করে সে আটতলা গুণল। ঝকঝকে সাদা বাড়ি। ছাদের ওপর দড়ি বেঁধে বেলুন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ছবি নেই কিন্তু বাড়িটার গড়নের সঙ্গে ছবির বাড়ির যেটুকু দেখা গেছে তাতে মিল আছে। রিক্সাওয়ালা ভাড়া চাইতেই সে মিটিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে কার্ড বের করে দেখল মিস্টার যোশীর বাড়িটা সাদা বাড়ির পাশে। ওটাও একটা লম্বা অট্টালিকা, কিন্তু সাদা নয়। ওই সাদা বাড়ির ছাদে উঠলে হয়তো ছবি তোলার ছাদটাকে দেখা যেতে পারে। নীল ঝুঁকি নিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে সাদা বাড়ির সিঁড়ি ভেঙ্গে লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো অল্পবয়সী ছেলে লিফটের জন্যে অপেক্ষা করছে। পাশাপাশি দুটো লিফট। একটি নামলে ওরা ভেতরে ঢুকল। লিফটম্যান নেই। ছেলে দুটো পাঁচতলার বোতাম টিপতেই সে ওদের দেখিয়ে ছ'তলার বোতামে চাপ দিল।

পাঁচতলায় ওরা নেমে যেতে নীল টপ ফ্লোরের বোতাম টিপল। ছয়তলায় একবার থেমে লিফট ওপরে উঠে আসতেই নীল বেরিয়ে এল। মাঝখানে করি-ডোর, দুপাশে ফ্ল্যাটের দরজাগুলো। ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি কোথায়। নীল এগোল। না, এদিকে কিছু নেই। উল্টোদিকে খানিকটা যাওয়ার পর সে সিঁড়ি দেখতে পেল। সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে কোলপসিবুল গেট। গেটে তালা ঝুলছে। অর্থাৎ ছাদে যাওয়ার পথ বন্ধ। সে ঝুঁকে তালাটাকে দেখল। দামী নয় কিন্তু তালা খোলার কায়দা তার জানা নেই। ছাদে যেতে হলে এই তালা ভাঙতে হবে। নীল তালাটাকে মোচড়াতে লাগল। কিন্তু তাতে কোন কাজ

হচ্ছে না। সে মাঝেমাঝে প্যাসেজের দিকে তাকাচ্ছিল। যদি কেউ তাকে এই কাজটা করতে দ্যাখে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। তালাটা ভাঙতে হলে শক্ত কিছু দরকার। সে চারপাশে তাকিয়ে একটা কিছু খুঁজল। তার নজরে পড়ল দেওয়ালের গায়ে সরু রডের গায়ে কয়েকটা বালতি ধরনের জিনিস ঝুলছে। সম্ভবত আগুন লাগলে ওগুলো কাজে লাগানো হবে। অনেক চেষ্টার পর রডটাকে খুলতে পারল সে। বালতিগুলোকে সিঁড়িতে নামিয়ে রডের একটা প্রান্ত তালার গর্তে ঢুকিয়ে চাপ দিতে লাগল সজোরে। খট্ করে শব্দ হতেই দেখা গেল ওটা ভেঙে গেছে।

বিশাল ছাদের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হল বেলুনটাকে খুলে দিলে কেমন হয়! নীল ধীরে ধীরে ছাদের একটা কোণে এসে দাঁড়াল। এখন রাত। স্পষ্টত কিছু দেখা সম্ভব নয়। তবু সে ছাদের চারটে দিকে ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করতে লাগল অপেক্ষাকৃত কোন নিচু ছাদের সঙ্গে সেই ছবির মিল আছে কিনা। প্রায় আধঘণ্টা ধরে লক্ষ্য করার পরে সে একটি টিভি এ্যান্টেনা বেষ্টিত ছাদকে চিহ্নিত করতে পারল। ছবির ছাদে একটা ড্রাম ছিল। মেয়েটি সেই ড্রামের ওপর উঠে বসেও ছবি তুলেছে। ড্রামটার রঙ লাল। ওই ছাদটায় একটা ড্রাম দেখা যাচ্ছে। রাত বলেই ঠিক রঙ টের পাওয়া মুশকিল। কিন্তু ওখান থেকে কেউ যদি ছবি তোলে তাহলে এই বাড়ির যে অংশ ধরা পড়বে তাই ছবিতে এসেছে বলে মনে হল নীলের। সে বাড়িটিকে ভাল করে ঠাওর করে নিল।

মিনিট পাঁচেক পরে থিয়েটার রোডে দাঁড়িয়ে রুমালে মুখ মুছল নীল। বাড়িটা পাশের রাস্তায়। সে হাঁটতে লাগল। এসব পাড়ায় মানুষজন যে যার নিজের মত থাকে। এমনিতেই জটলা নেই, সন্ধ্যের পরে যেটা আরও বেশী হয়ে যায়। হঠাৎ একটা মোটরবাইকের আওয়াজ কানে এল। নীল দেখল বাইকটা ফুটপাতে উঠে একটা দোকানের সামনে থামল। জিন্‌স পরা স্মার্ট ছেলেটি ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে বাইক থেকে নেমে যে দোকানটায় ঢুকল সেটা একটা স্টুডিও।

নীল থমকালো। এই স্টুডিওর কেউ মেয়েটির ছবি তুলেছে নাকি? সে আর একটু এগোতেই ছাদ থেকে দেখা বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেল। পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ি। মেয়েটি কোন্ ফ্ল্যাটে থাকে? অথবা মেয়েটি হয়তো অন্য জায়গায় থাকে এখানে ছবি তুলতে এসেছিল। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না এমন সময় আবার মোটরবাইকের আওয়াজ পেল। আগের ছেলেটি ফুটপাত দিয়ে

বাইক চালিয়ে নীলের পাশে সেটা দাঁড় করিয়ে বাড়িটার ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ছেলেটার অতিরিক্ত স্মার্টনেস নীলের চোখে পড়ল। একটা দারোয়ান গোছের লোক সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল, নীলকে এগোতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই সাব?'

'এইমাত্র যিনি ঢুকলেন—।' নীল কোনরকমে বলতে পারল। ছেলেটির কিছুই সে জানে না।

'লালমসাব্? ফটোগ্রাফার? ওয়েট করুন, গাড়ি রেখে গেছে যখন তখন এখনই নেমে আসবে। ফ্ল্যাটে যাবেন না অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে, মডেল-টডেল থাকে তো!'

'মডেল?'

'বাঃ, সাহেব ছবি তোলেন, তাই মডেলরা আসেন।'

'তার জন্যে তো স্টুডিও আছে।'

'সেখানে প্রাইভেট পার্টিরা যেতে চায় না সবসময়।'

'লালমসাহেব কোন্ তলায় থাকেন?'

'টপ ফ্লোর। ছাদের ওপর একটা ফ্ল্যাটে।' দারোয়ান মাথা নাড়ল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন, ঠিক দেখা পেয়ে যাবেন।' লোকটা ফুটপাতে নেমে গেল।

নীল ওর যাওয়া লক্ষ্য করে একটু সরে এল। যদি এই বাড়ির ছাদে ছবিগুলো তোলা হয় তাহলে সেই মেয়েটি প্রাইভেট পার্টি হয়ে এসেছিল লালমের ফ্ল্যাটে ছবি তোলাতে। খুব সোজা অঙ্ক। লালম ছবিগুলো তুলে বিক্রি করেছে অমিতাভকে।

এখানেই খটকা লাগল। অমিতাভ কাজ করে ম্যাডামের নির্দেশে। লালমের কাছ থেকে ছবি কেনার সামর্থ্য তার একার নেই। টাকাপয়সা না পেয়ে লালমের মত লোক নেগেটিভসুদ্ধ ছবি দিয়ে দেবে ভাবা যায় না। এক্ষেত্রে ম্যাডামের অবশ্যই কিছু খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু লালমের কাছে ছবি তুলতে মেয়েটি আসবেই বা কেন? বিশেষ করে সম্পূর্ণ নগ্ন ছবি। লালমের সঙ্গে মেয়েটার সম্পর্কই বা কি!

নীলের মনে হল একটু মদ খাওয়া দরকার। টেনশন হলেই—। মিস্টার যোশীর বাড়ি বেশী দূরে নয়। তিনি দুটো পেগ নিশ্চয়ই খাওয়াবেন। কিন্তু এই বাড়ির সামনে থেকে সরে যেতে মন চাইছে না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল ওই লালম তাকে একই সঙ্গে মেয়েটি এবং ম্যাডামের কাছে নিয়ে যেতে পারে।

তার টাকার দরকার। অনেক টাকা।

মিনিট পনের কেটে গেল। কেউ একজন বেরিয়ে আসছে। নীল শাড়ি মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক মহিলা। এই মুহূর্তে আর মহিলার দিকে তাকানোর মানসিকতা তার নেই। লালম নামলেই ওকে অনুসরণ করবে। কিন্তু বাইকে থাকা কাউকে ট্যাক্সি নিয়েও তো পিছু ধাওয়া করা সম্ভব নয়। বাইকটাকে খারাপ করে দিলে কেমন হয়! সে বাইকের কাছে এগিয়ে গিয়ে চারপাশে তাকাল। নির্জন শুনশান রাস্তা। সে চট করে ঝুঁকে বসে পেছনের চাকার হাওয়া বেরুবার মুখটা খুলে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে বুঝল কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট যখন কেটে গেল তখন আর ধৈর্য রাখতে পারল না নীল। হয়ত লালম আজ বেরুবে না। কিন্তু বাইকটা? সে বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখল লিফটে লিফটম্যান বসে আছে টুলে। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়াল লোকটা। নীল গম্ভীর মুখে ভেতরে ঢুকে বলল, 'টপ ফ্লোর।'

লিফটম্যান বলল, 'আধতলা হাঁটতে হবে স্যার। লালমসাবের কাছে যাবেন তো?'

'হুঁ।' মাথা নাড়ল নীল।

লিফটম্যানের দেখানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল নীল। ছাদের দরজাটা বন্ধ। কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। চওড়া ছাদ। নীল সেখানে পেঁৗছে যেন সম্বিৎ পেল। কি বলতে পারে সে লালমকে? ওর সঙ্গে তো কিছু বলার নেই। লোকটাকে যদি সে বলে আপনার তোলা ছবিগুলো নেগেটিভ সমেত আমার কাছে আছে তাতে কি কাজ হবে? সে ছাদের একপাশের ফ্ল্যাটটার দিকে তাকাল। দুঘরের ফ্ল্যাট। একটা আধা পাঁচিল দিয়ে বাকি ছাদের সঙ্গে কিছুটা আড়াল করা হয়েছে। সে পাঁচিলের কাছে গিয়ে লাল ড্রামটাকে দেখতে পেল। এবার সে নিঃসন্দেহ, এই ছাদেই ছবিগুলো তোলা হয়েছিল।

দুটো ঘরেই আলো জ্বলছে। কিন্তু কোন মানুষের কথাবার্তা নেই। সে একটু অপেক্ষা করল। তারপর ছোট্ট গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। মনে মনে সে ঠিক করে নিয়েছে, লালমকে বলবে তাকে ম্যাডাম পাঠিয়েছে। ছবিগুলোর বদলে লালম ঠিক কত টাকা পেয়েছে এটা জানার জন্যে ম্যাডাম তাকে বলেছেন। একবার কথা শুরু করতে পারলে দেখা যাবে কি হয়!

সে ডাকল, 'লালমসাহেব?'

ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। দ্বিতীয়বারেও একই অবস্থা।

নীল ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ঘরে কেউ নেই। সে ঘরে ঢুকে তৃতীয়বার ডাকল। তারপর পাশের ঘরে উঁকি মারল। সঙ্গে সঙ্গে বরফ হয়ে গেল নীল। মেঝের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে লালম। তার মাথার একপাশ থেকে রক্তের ধারা বেরিয়ে মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে। লালমের পরনে কোন শার্ট নেই, শুধুই জিন্সের প্যান্ট।

একটু আগে জ্যান্ত দেখা লোকটা মরে গেছে। সে চারপাশে তাকাল। প্রচুর ছবি। প্রত্যেকটাই বিভিন্ন মহিলার। যার অনেকগুলোই কোন পোশাক ছাড়া। দেওয়ালে টাঙানো, দড়িতে ক্লিপ দিয়ে আটকানো। অর্থাৎ এখানেই একটা ডার্করুম করে নিয়েছিল লালম। লোকটাকে মারল কে?

নীল ছবিগুলোর দিকে তাকাল। কাউকেই সে চেনে না। অন্তত তার কাছে যার ছবি আছে তার দেখা পেল না এই ছবির প্রদর্শনীতে। এবং তখনই নীলের খেয়াল হল তার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। লিফটম্যান তাকে দেখেছে কিন্তু আর একবার দেখার সুযোগ করে দেওয়া বোকামি হবে। সে ঘুরে দাঁড়াতেই মেঝেতে কিছু পড়ে থাকতে দেখল। হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখল ওটা খুব দামী লেডিস ওয়াচ। ব্যান্ডটা ছিঁড়ে গেছে। ঘড়িটাকে পকেটে পুরে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে ছাদে। আর তখনই নিচের সিঁড়িতে মানুষের গলা পেল। কেউ একজন লিফটম্যানের সঙ্গে কথা বলছে। পলকে সে সরে এল চিলেকোঠার ঘরটার পাশে। নিচে নামার রাস্তা ওই একটাই। সিঁড়ি। এপাশে ঝুঁকে বুকের ধড়ফড়ানি বাড়ানো ছাড়া কোন কাজ হল না। সে দেখল একটা লোক ছাদে উঠে লালমের ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটার চেহারার গড়ন এই অন্ধকারেও বেশ চেনা মনে হচ্ছিল। নীল প্রায় নিঃশব্দে আড়াল থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে চলে এল। সে শুনল লোকটা ডাকছে, 'মিস্টার লালম, ম্যাডামের কাছ থেকে আসছি!'

নীল আর দাঁড়াল না। লিফটম্যান লিফট নিয়ে নিচে চলে গেছে। সে সিঁড়ি ব্যবহার করল। ঝড়ের মত নিচে নামতে লাগল সে। আর তখনই খেয়াল হল এইমাত্র যে লোকটা ছাদে উঠেছে তাকেই সে ড্রিমল্যান্ড এবং রেস-কোর্সে দেখেছে।

আধঘণ্টা পরে নীলকে দেখা গেল বৃদ্ধ যোশীর মুখোমুখি বসে থাকতে। মিস্টার যোশী, দামী স্কচে গ্লাস ভরে এগিয়ে দিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আর আসবেন না। এখন সাড়ে আটটা বাজে, আমি ডিনার খাই ন'টায়।'

নীল বলল, 'জরুরী কাজে আটকে গিয়েছিলাম। আমার জন্যে আপনি সঙ্কোচ করবেন না। ঠিক নটায় আমি চলে যাব।'

'আবার কাজ আছে?'

'কাজ? না। আপনার নিয়ম ভাঙব না, তাই।'

'বেনিয়ম না করলে নিয়মের যথার্থতা টের পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে নিয়ম ভাঙা দরকার। তাছাড়া আমি ডিনারের জন্যে মিনিট পনের নেব। ততক্ষণ আপনি একা থাকতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। আপনাকে আমি ডিনারে বলতে পারতাম কিন্তু আমার স্ত্রী তাদের লেডিস ক্লাবের বলপার্টিতে গিয়েছেন।'

জিভে হুইস্কির স্বাদ যেন নতুন জীবন দিল। খানিক আগে যেভাবে সে বেরিয়ে এসেছে ওই বাড়ি থেকে, আড়ালে অপেক্ষা করে লোকটাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে তাতে প্রচুর উত্তেজনা ছিল। সে চেয়ারে ভাল করে শরীর এলিয়ে দিল।

মিস্টার যোশী যে কতখানি বড়লোক তা রেসকোর্সে আন্দাজ করতে পারেনি। বাড়ির ভেতর ঢুকে সেটা বুঝতে পারছিল নীল। মদ খেতে খেতে মিস্টার যোশী বলছিলেন, 'অনেক দিনের অভ্যেস আমার। রোজ রাত্রের খাওয়ার আগে দু পেগ স্কচ খাই। এতে শরীর ঠিক থাকে। মনও। আমার বয়স হয়েছে। আমার স্ত্রী হৈ-হট্টগোল পছন্দ করেন, লেট নাইট করেন পার্টিতে গিয়ে। আমি ওসব পারি না।'

নীল বলল, 'ঠিকই করেন।'

'হ্যাঁ। আমি টাকা ভালবাসি। সারাদিন টাকার জন্য খাটি। আমার প্রচুর টাকা আছে। হ্যাঁ, তা আছে, কিন্তু থাকলেই আরও চাইব না কেন? আমার স্ত্রী খুশীতে আছেন। আমার ছোট মেয়েকে আপনি দেখেছেন। খুব শান্ত মেয়ে। পড়াশুনায় ভাল। কোন বদ দোষ নেই। প্রবলেম আমার একটাই—।' মিস্টার যোশী হঠাৎই থেমে গেলেন। এত টাকা যাঁর তিনিও সমস্যামুক্ত নন, নীল ভাবল।

নীলের গ্লাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে এক পেগ স্কচ ঢাললেন মিস্টার যোশী। বরফ মিশিয়ে এগিয়ে দিকে বললেন, 'নাবিকদের কিন্তু অসাধারণ লিভার থাকে না। অত জলদি শেষ করা ঠিক নয়।'

নীল হাসল, 'জলে থাকতে থাকতে অভ্যেসটা হয়ে গেছে।'

'আপনার সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'এমন কিছু বলার নেই। বেকার ছিলাম। জাহাজে চাকরি নিয়ে দশ বছর আছি। যা রোজগার করেছি উড়িয়ে দিয়েছি। মা মারা গেছেন। বাবা অনেক দিন। ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক দশ বছর আগে ভাল ছিল না, এখন কি হবে জানি না।'

'এবার দেখা হয়নি?'

'সময় পাইনি। আমি গত রাত্রে কলকাতায় এসেছি।'

'পৃথিবীতে তাহলে নিজের বলতে কেউ নেই?'

'ঠিক তাই।'

একজন কাজের লোক এসে বিনীতভাবে জানাল সাহেবের ডিনার লাগানো হয়ে গেছে।

মিস্টার যোশী উঠে দাঁড়ালেন, 'হেলপ ইওরসেল্ফ। এখানে কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

এরকম হোস্ট কখনও দ্যাখেনি নীল। ড্রিঙ্কস এবং ডিনার চোখের সামনে আলাদা করে দিলেন। কিছু কাজুবাদাম ছাড়া টেবিলে কোন চাটের ব্যবস্থা নেই। তার খিদেও পাচ্ছে। ভদ্রলোক স্ত্রীর দোহাই দিলেন ডিনারে না ডাকার কারণ হিসেবে। অদ্ভুত।

চটপট তৃতীয় গ্লাস শেষ করল নীল। বিনা পয়সায় দামী মদ চালিয়ে যাও। হঠাৎ চোখের সামনে লালমের মুখ মনে পড়ল। অত স্মার্ট ছেলে কিভাবে খুন হয়ে গেল। কেউ ওর মাথার পেছন দিকে আঘাত করেছে। কিন্তু

হত্যাকারী কি ওই ফ্ল্যাট বাড়িতেই থাকে ? নইলে তার চোখের সামনে দিয়ে একজন মহিলা ছাড়া আর কাউকে সে বের হতে দ্যাখেনি। হত্যাকারী যদি বাইরে থেকে আসত— । না সম্ভব নয়। লালম ভেতরে ঢোকার আগে নিশ্চয়ই হত্যাকারী সেখানে ছিল। বাইরের লোককে নিজের ফ্ল্যাটে রেখে যাবে কেন লালম ? দারোয়ানের কথা অনুযায়ী নিজের ফ্ল্যাটে হুট করে লালম কারও সঙ্গে দেখা করত না। তাহলে ? একমাত্র কোন মহিলার পক্ষে ওখানে থাকা সম্ভব। এটা অবশ্য ওই লিফটম্যানকে প্রশ্ন করলেই জানা যেত। কিন্তু মহিলার পক্ষে কি লালমকে খুন করা সম্ভব ? নীলের মনে পড়ল ঘোমটা মাথায় একজন মহিলাকে সে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল। তিনিই কি ? তার মনে হল সেই ম্যাডাম নামক মহিলা হলেও হতে পারেন ? না, তা হবে না। তাহলে ম্যাডামের সহকারী লালমের খোঁজে আসত না।

চার পেগ খাওয়া মাত্র মিস্টার যোশী ফিরে এলেন, 'সরি, অনেকক্ষণ একা আছেন।'

'একটুও অসুবিধে হয়নি।'

মিস্টা যোশী চেয়ারে বসে ইন্টারকমের বোতাম টিপে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'দিদি ফিরেছে ? ও, ফিরলেই আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে।'

পঞ্চম পেগ ঢালল নীল, 'আমি কখন উঠব বলে দেবেন।'

'অ্যাঁ। না না ক্যারি অন। তাহলে আবার সমুদ্রে যাবেন ?'

'এ ছাড়া কোন উপায় নেই।'

'যে যে কাজটা জানে তার সেই কাজটা করা ভাল।'

'হ্যাঁ। তাছাড়া এবার আমার টাকার দরকার।'

'এবার কেন ?'

'এখানে এসে জানলাম, আমার এক প্রিয়জনকে কেউ বা কারা অ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। জীবন্মৃত হয়ে আছে সে। তাকে চিকিৎসা করিয়ে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে প্রচুর টাকার দরকার।'

'আপনার ইনভলভেন্ট কি ?'

নীল হাসল, জবাব দিল না। মিস্টার যোশী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি পুরুষ না মহিলা ?

'অবশ্যই মহিলা।'

'সুন্দরী ?'

'এক সময় তাই মনে হত।'

মিস্টার যোশী নিজের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। তাতে হিরের আংটি দু দুটো। মুখে বললেন, 'স্যাড, খুব স্যাড।'

আর তখনই ইন্টারকম আওয়াজ করল। মিস্টার যোশী সাড়া দিলেন। তারপর বললেন, 'আমি চাই না তুমি এভাবে একা ঘুরে বেড়াও। অসুবিধে কি হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি। কি কথা বলার আছে তোমার? আমি পছন্দ করছি না এবং এর পরেও যদি তুমি রিপিট কর আমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। কি? তুমি প্রমিজ করছ? আর ইউ শিওর? না ইন্টারকমে নয়, কাম হিয়ার, সামনাসামনি বলে যাও। হ্যাঁ, আমার সামনে গেস্ট আছে কিন্তু কিছু হবে না।' যন্ত্রটাকে বন্ধ করে মিস্টার যোশী বললেন, 'আমার মেয়ে ' বড় মেয়ে।'

'ও।'

'ওকে নিয়েই আমার প্রব্লেম।'

'কি রকম?'

'স্কুলের শেষ ধাপে গিয়ে কিছু ছেলের পাল্লায় পড়ে হৈহৈ করতে শিখল। কলেজে উঠে আর একটু বেপরোয়া। ও কি করে জানতে পারল এজেন্সির লোক লাগিয়েছিলাম। যত সব রটন অথচ গ্ল্যামার বয় ওর বন্ধু। এর বাইকে চড়ে ওখানে যাচ্ছে ওর সঙ্গে!' মিস্টার যোশী হঠাৎ চুপ করলেন।

'আপনার স্ত্রী কিছু বলেন না?'

'আমার স্ত্রীর চেয়ে ও বেশী বুদ্ধিমতী। মুশকিল হল ও ভুল জায়গায় যেতে পারে। আমার টাকার লোভে ওকে কেউ ব্যবহার করতে পারে। ভয়টা সেখানেই।'

দরজা খুলে গেল। দুধ-সাদা সিল্কের গাউন পরে যে মেয়েটি ঢুকল পাঁচ পেগ হুইস্কি পেটে থাকা সত্ত্বেও পাথর হয়ে যাচ্ছিল নীল তাকে দেখে। মেয়েটি অপরাধীর ভঙ্গীতে সামনে এসে দাঁড়াল, 'প্রমিজ।'

'থ্যাংক ইউ।'

'আমি এবার যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, তোমার বাঁ হাতে কি হয়েছে?'

'ও কিছু না!'

'ব্যান্ডেড লাগিয়েছ কেন?'

'একটু ছড়ে গিয়েছিল।'

'ড্যাড, আমি কিছুদিনের জন্যে মামার বাড়িতে যেতে চাই।'

'কেন ?'

'কলকাতায় আমি টায়ার্ড।'

'ঠিক আছে, তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলি।'

'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

মেয়েটি চলে গেল। নীল লক্ষ্য করল মেয়েটা একবারও তার দিকে তাকায়নি। ওর ননীর মত চামড়ায় অদ্ভুত গম্ভীর ছায়া। না, তার ভুল হয়নি। এই মেয়েই সে। ওর বোনের সঙ্গে সামান্য মিল থাকায় রেসকোর্সে সে একটু ধন্দে পড়েছিল। মিস্টার যোশী বললেন, 'মিলানের পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কারণ আপনি আসার পর রেসে জিতলাম এবং এটা ঘটল।'

নীল মাথা নাড়ল, 'আপনি আমাকে যা পাওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী দিচ্ছেন।'

মিস্টার যোশী হাসলেন, 'আপনি এখন কিভাবে ফিরবেন ?'

নীল কাঁধ ঝাঁকালো, 'রিক্সা পেয়ে যাব।'

'রিক্সা ? আপনি এখান থেকে রিক্সার দূরত্বে থাকেন ?'

'ইলিয়ট রোডের একটা হোটেলে উঠেছি।'

'আমার ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছে।' মিস্টার যোশী উঠে দাঁড়ালেন হাত বাড়িয়ে, 'আজকের রাতটার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

করমর্দন করে ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন। ওঁর আচরণ এমন হঠাৎ করে কেন বদলে গেল তা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না নীল। এমন ভদ্রভাবে দরজা দেখিয়ে দেওয়া যায় ? সে স্কচের বোতলের দিকে তাকাল। ইচ্ছে থাকলেও আর খাওয়ার উপায় নেই। নীল বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল।

লম্বা করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল মেয়েটার কথা। মি, মিতা, মিলান। ওর নাম মিলান। ইতালির একটি ছোট্ট স্মৃতির শহর মিলান। মিস্টার যোশীর মেয়ের দারুণ ছবি তার কাছে আছে। আর, দারুণ ! কিন্তু ওর বাঁ হাতের কবজির কাছে ছড়ে গেল কেন ? হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা ভয় যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল নীলের কাছে। না, এ হতে পারে না ? অসম্ভব।

সে বাইরে বেরিয়ে আসতেই একটা বিরাট গাড়ি সজোরে এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে এবং সেইসঙ্গে সোডার বোতল খোলার শব্দের মত হাসি ছিটকে উঠল। ওপাশে আর একটা সাধারণ গাড়ির পাশে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। নীলকে দেখামাত্র সে সেলাম করল। অর্থাৎ মিস্টার যোশীর আদেশ ইতিমধ্যে ড্রাইভার পেয়ে গেছে।

বড় গাড়িটার দরজা খুলে গেল। মহিলার গলা ভেসে এল, 'গুড নাইট ডার্লিং।'

'গুড নাইট।' একটা হেঁড়ে গলা ভেতর থেকে জবাব দিল।

নীল দেখল মিসেস যোশী তাঁর বিশাল শরীর টেনে নিয়ে এলেন বাইরে। অদ্ভুতভাবে হাতটা নাড়তেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং গাড়িটা চলে গেল: মহিলা সিঁড়ির ধাপে পা রেখেই নীলকে দেখতে পেলেন. 'আপনি এখানে!'

'মিস্টার যোশী নেমন্তন্ন করেছিলেন।'

'তাতো করবেনই। আমাকে না বলে ওকে উইনার হর্স বলেছেন কিন্তু ওঁর আগে আমার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল। এই জন্যেই বলে, প্রয়োজন হলে একটা সাপকে বিশ্বাস করো কিন্তু কখনই কোন পুরুষকে নয়।'

'আপনি অকারণে এসব বলছেন।'

'ঠিক আছে, নেক্সট দিনে আপনি আমাকে উইনার দিন, আমিও আপনাকে নেমন্তন্ন করব। ওকে?' মিসেস যোশী পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'আমি কোথায় উইনার পাব?'

'আজ যেখান থেকে পেয়েছেন!'

'প্রতিদিন যে একই ব্যাপার ঘটবে তার নিশ্চয়তা নেই।'

'দেন ইউ গেট লাস্ট। এ বাড়িতে আর যেন না দেখি আপনাকে।' ফোঁস করে উঠলেন মিসেস যোশী। হনহনিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। নীল তাঁকে ডাকল, 'শুনুন।'

মিসেস যোশী দাঁড়ালেন না।

মিস্টার যোশীর গাড়িতে হোটেলে ফেরার সময় নীলের মাথার ভেতরটা কিরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। বড়লোকদের আচার আচরণ অনেকসময় একটু অদ্ভুত হয়। ওদের পরিবারে মিস্টার যোশী এবং ওঁর ছোট মেয়েকে তার অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মিসেস যোশী বাইরের লোককে ডার্লিং বলেন, স্বামীর সঙ্গে জেদের পাল্লায় নেমে পড়েন, দরকার না থাকলে

অপমান করতে ওঁর বাধে না। আর মিলান, যে মেয়ে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস পায় না সে ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় নিজের নগ্ন শরীরে ভরিয়ে দিতে একটুও সঙ্কোচ করে না। নীল পকেটে হাত দিল। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত কিছু আঙুলে ঠেকল। জিনিসটা বের করে আনামাত্র, গাড়ির ভেতরেও সেটা চকচক করে উঠল। ঘড়ি। মহিলাদের ঘড়ি। মিলানের বাঁ হাতের কবজিতে ব্যান্ডেড। এই ঘড়ি পড়েছিল লালমের মৃতদেহের পাশে। লালম কি মিলানের হাত ছড়ে যাওয়ার কারণ ?

টেডিলালের হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল নীল তারপর ড্রাইভারকে বলল, 'এই হোটেলে আমি আছি। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।'

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল যে সাহেবকে রুমে পেঁছে দিতে হবে নাকি ?

নীল বলল, 'আমি পাতি মাতাল নই। গুড নাইট। ওহো, নো। তুমি এখন মিস্টার যোশীর বাড়িতে ফিরে যাবে, তাই না ?'

'হ্যাঁ সাহেব।'

'দেন টেক ইট।' হাত বাড়িয়ে ঘড়িটাকে ড্রাইভারের সামনে ধরল সে।

ড্রাইভার সেটা নিতেই বলল, 'এই ঘড়িটাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছে মিস্টার যোশীর বড় মেয়ে মিলানের ঘড়ি। মিসেস যোশীরও হতে পারে। যার ঘড়ি তাকে দিয়ে দিও।'

ড্রাইভার বলল, 'মনে হচ্ছে বড় মিসিবাবার ঘড়ি। কোথায় পেয়েছেন ?'

'পেয়েছি। পেয়েছি। গুডনাইট।' নীল আর কথা না বলে হোটেলের ভেতরে ঢুকে পড়ল। রেস্টুরেন্টে এখন জোর খাওয়া চলছে। ও জায়গাটা পেরিয়ে আসতে টেডিলালের দেখা পেল রিসেপশনে। টেডিলাল ওকে ইশারায় ডাকল। নীল কাছে যেতে টেডিলাল নিচু গলায় বলল, 'এখন থেকে বেশী রাত করো না।'

'কেন ?'

'পুলিশ খুব ঘুরছে। একটা কিছু ব্যাপার হয়েছে এ তল্লাটে। ঠিক বুঝতে পারছি না। আজও এসেছিল খবর নিতে, নতুন কেউ এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করছিল। এখানকার দারোগাটাকে আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। আমার পাশের বাড়ির একটা মেয়েছেলের কাছে ও মাঝে মাঝে আসে। সে পর্যন্ত ওকে বিশ্বাস করে না।'

'কার কাছে আসে ?'

'তাজ। ওই যে তোমার ঘরের যে জানলা খুলতে নিষেধ করেছিলাম সেই দিকে থাকে। যাকগে, তুমি বেশী রাত করো না, তাহলেই হবে।' টেডিলাল বলল।

একটা লম্বা ধন্যবাদ জানিয়ে নীল নিজের ঘরের দিকে এগোল।

দরজার তালা খুলে ভেতরে পা বাড়ানোমাত্র জ্যাকির গলা পেল সে। নীলকে দেখে ওপরে উঠে এসেছে ছোকরা, 'স্যার, সাদা বাড়িটাকে পেয়ে গেছি।'

কথাটা নীলের মাথায় পরিষ্কার হল না।

জ্যাকি বলল, 'আপনি বলেছিলেন একটা সাদা বাড়ি যার মাথায় বেলুন উড়ছে, খুঁজে বের করলে ভাল টাকা পাওয়া যাবে। মনে নেই?'

'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ।' নীলের কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না?'

জ্যাকি দাঁত বের করে হাসল, 'বাড়িটাকে পেয়েছি স্যার।'

'গুড। কিন্তু জ্যাকি, এখন আমি খুব টায়ার্ড। কাল সকালে নাহয় কথা বলব।'

'ওকে স্যার। ডিনার?'

'রুটি আর মাংস।'

'বোনলেশ চিলিচিকেন?'

'যা ইচ্ছে।'

জ্যাকি চলে গেল। নীল দরজাটা বন্ধ করে খামটাকে খুঁজল। ছবিগুলো থেকে একটা বের করে চোখের সামনে ধরল। হ্যাঁ, মিলানই। একশ ভাগ মিলান। এই দারুণ শরীরের মেয়েটা আজ সন্ধ্যেবেলায় লালমকে খুন করেছে। ঘোমটা মাথায় যে মহিলা ওই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে-ই তা হলে মিলান? আহা সুন্দরী, তোমার ভাগ্যে কি আছে নির্ধারণ হবে সেই লিফটম্যানটার ওপর। সে যদি তোমাকে দেখে থাকে তা হলে গেলে! নীল সতর্ক হাতে ছবি খামে ঢুকিয়ে ব্রিফকেসে রেখে দিল। ব্রিফকেসটাকে এখান থেকে সরাতে হবে। অন্যের জিনিসে সবসময় একটা বিপদের গন্ধ থাকে।

ঘুম ভাঙতেই অদ্ভুত একটা অস্বস্তি। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে সে টয়লেটে চলে গেল। জ্যাকি এসেছে চা নিয়ে। দরজার শব্দে ঘুম ভেঙে ছিল। নীল জ্যাকিকে একটা খবরের কাগজ আনতে বলল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে যখন জ্যাকি সেটা হাজির করল ততক্ষণ নীলের চা খাওয়া শেষ।

জ্যাকি বলল, 'সাদা বাড়িটার কথা শুনবেন স্যার?'

নীল কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, 'এক সেকেন্ড!' এবং তখনই সে খবরটা দেখতে পেল। 'ফটোগ্রাফার এবং লিফটম্যান খুন।' দুটো মৃত-দেহের ছবি দেওয়া হয়েছে কাগজে। লিফটম্যান খুন? লোকটা কখন খুন হল। সে যখন নিচে নেমে এসেছিল তখন লোকটা লিফটে ছিল। ওকে কে খুন করল? লালমের কাছে যারা গিয়েছে তাদের নাম বলার জন্যে কেউ বেঁচে রইল না। কে ওকে সরাল! নিশ্চয়ই মিলানের পক্ষে ওই বাড়িতে ফিরে গিয়ে লোকটাকে খুন করা সম্ভব নয়। তা হলে? হঠাৎ মনে হল সেই লোকটার কথা যে তার পরপর লালমের কাছে পৌঁছেছিল। লালম খুন হয়ে গেছে জেনে তার আসার একমাত্র সাক্ষীকে সরিয়ে দিয়ে নেমে এসেছিল লোকটা? অত ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে? যদি ও-ই করে তা হলে—! লোকটা সম্পর্কে কিছুই ভাবতে পারছিল না নীল। কিন্তু দুটো মানুষ একই বাড়িতে গতরাত্রে খুন হয়েছে এটা সত্যি। সে বিড়বিড় করল, 'দু দুটো লোক খুন হয়ে গেল!'

জ্যাকি চট করে চলে এল পেছনে। ছবি দুটো দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় মার্ডার হল স্যার?'

নীল রাস্তার নাম বলল।

'মাই গড! সাদা বাড়িটা তো ওখানেই?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ আমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওরা ওই রাস্তাই বলেছে।' ঝুঁকে পড়ল জ্যাকি, 'খুনটা কি ওই বাড়িতেই হয়েছে?'

'না। এই বাড়ির ন'তলায় নয়।'

'যাক, বেঁচে গেলাম।'

'তার মানে?'

'বন্ধুদের আমি বাড়িটার কথা জিজ্ঞাসা করেছি, মাল পাওয়া যাবে বলেছি, আর সেই বাড়িতেই দুটো মার্ডার হয়ে গেল। কথাটা ঠিক শালা হিটলারের কানে চলে যেত।'

'হিটলার কে?'

'থানার বড়বাবু। কোন দয়ামায়া নেই।'

'তোমাদের বড়বাবু পাশের বাড়ির মেয়েটার বন্ধু?'

'বন্ধু? ছাই। রাত বারোটায় মাঝে মাঝে আসে। স্যার!'

'বল।'

জ্যাকি একটা কাগজ বের করল, 'সাদা বাড়ির ঠিকানা।'

কাগজটা নিয়ে নীল বলল, 'এটার যদিও এখন কোন প্রয়োজন নেই তবু কথা দিয়েছি বলে তোমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি।'

জ্যাকি খুশী হয়ে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। বড্ড গায়ে লাগল নীলের। এই সময় পঞ্চাশটা টাকা তার কাছে খুব মূল্যবান।

কাগজে যে খবরটা বেরিয়েছে তা পড়ল নীল। ফটোগ্রাফার লালমের সঙ্গে প্রচুর মেয়ের বন্ধুত্ব ছিল। এই খুন সেই কারণেই বলে পুলিশ সন্দেহ করছে। যে লোকটা বেঁচে থাকলে লালমের কাছে কারা বা কে এসেছে জানা যেত সে নেই। হত্যাকারী কোন সাক্ষী রাখেনি। দুটো হত্যা একইভাবে হয়নি। এক-জনকে মাথার পেছনে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয়-জনের ফুসফুস সরু কোন অস্ত্র দিয়ে ফুটো করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয় খুনের তফাৎ আছে। বাড়ির দারোয়ানের কাছে শোনা গেছে সে সবসময় পাহারায় থাকে না ও থাকার কথাও না। তবে সন্ধ্যেবেলায় লালম যখন তার বাইকে ফিরেছিল তখন একটা লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল। দারো-য়ানের সঙ্গে লালমকে নিয়ে কথাও হয়। দারোয়ান ভেবেছিল বাইরে বাইক থাকায় লালম নিচে নেমে আসবে। তারপর দারোয়ান নিজের কাজে চলে যায়। পুলিশের কাছে সে বলেছে যে লোকটা এসেছিল তার চেহারা বেশ শক্তপোক্ত এবং হাতে উল্কি আছে। উল্কিটা ঠিক কিসের তা লক্ষ্য করেনি ভাল করে তবে মাছের মত কিছু বলে মনে পড়ছে দারোয়ানের। পুলিশ এই লোকটিকে খুঁজে

বের করার চেষ্টা করছে। একে ধরতে পারলে জোড়া খুনের রহস্য সমাধান করা যাবে বলে পুলিশের ধারণা।

থরথর করে কাঁপতে লাগল নীল। খপ করে নিজের বাইসেপ আঁকড়ে ধরল। নীল জলপরী সেখানে উল্কি হয়ে হাসছে। হাফস্লিভ শার্ট পরে না বের হলে এটা কারো চোখে পড়ত না। কাল যত লোকের সঙ্গে সে কথা বলেছে সবাই নিশ্চয়ই উল্কিটাকে দেখেছে। তবে হাত উঁচুতে না তুললে চট করে চোখে পড়ার কথা নয়। যারা দেখেছে তারাই আজ কাগজে খবরটা পড়ে পুলিশকে জানিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পুলিশ তাকে খুঁজে বের করতে পারবে? এই হোটেলে একমাত্র জ্যাকি ছাড়া কেউ তার উল্কি দ্যাখেনি। নীলের মনে হল একটা বিরাট ফাঁদ তার দিকে হু হু করে এগিয়ে আসছে যার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

কোন দরকার ছিল না কিন্তু সে নিজের অজান্তে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ বিপরীত চিন্তা এল। কি উল্টোপাল্টা ভাবছে সে। হাতে এমন উল্কি অনেকেরই থাকে। খিদিরপুরের ডক এলাকায় অনেক জাহাজীর বাইসেপে উল্কি দেখা যাবে। তা হলে পুলিশের সন্দেহ প্রত্যেকের ওপর পড়তে পারে না। অবশ্য আজ যদি সে কলকাতা ছেড়ে চলে যায় তা হলে কোন সমস্যাই থাকে না। কিন্তু তা হলে? না, অসম্ভব। সে কথা দিয়ে এসেছে। একটা মানুষের নবজন্মের ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। যেভাবেই হোক টাকা রোজগার করতে হবে। নীল চোখ বন্ধ করল। ভাবনাটা মাথায় আসতে নিজেই হেসে ফেলল। এটা ব্ল্যাকমেইল? শেষপর্যন্ত সে ব্ল্যাকমেইল করে টাকার ব্যবস্থা করবে! ম্যাডাম যেটা করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি, তার হাতে সেটা করার অপার সুযোগ রয়েছে।

এই সময় দরজায় শব্দ হল। নীল চমকে উঠল। দরজা খুলতে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। এত তাড়াতাড়ি পুলিস খবর পেয়ে যাবে? সে চটপট একটা ফুলস্লিভ শার্ট পরে নিল। তারপর শুকনো গলায় দরজা খুলতে একটা লোক তাকে সেলাম করল।

নীলের মনে হল লোকটাকে সে চেনে কিন্তু ঠাওর করতে পারল না।

লোকটা বলল, 'সাব, নিচে গাড়িতে বড়মিসিবাবা বসে আছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আপনি একটু নিচে আসবেন?'

এবার মনে পড়ল। গত রাত্রে এই লোকটাই তাকে মিস্টার যোশীর নির্দেশে

হোটেলে পেঁছে দিয়ে গিয়েছিল। এর হাতেই সে ঘড়ি ফেরৎ দিয়েছিল।

মিনিট তিনেক সময় নিল নীল। তৈরী হয়ে নিচে নেমে দেখল ট্রাম রাস্তার ধারে একটা লম্বা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখামাত্র ড্রাইভার পেছনের দরজা খুলে দিল। নীল দেখল মিলান বসে আছে এককোণে।

গাড়ি শীততাপনিয়ন্ত্রিত। মিলানের পরনে হলুদ ছিটের ফ্রক। খুবই ঢিলেঢালা। সে গাড়িতে উঠে বসতেই মিলান প্রশ্ন করল, 'আপনি কে?'

'আমি নীল।'

'আমি ওই পরিচয় জানতে চাইছি না।'

'আপনি কি জানতে চাইছেন খুলে বলুন।'

'বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কি করে?'

'রেসকোর্সে। কিন্তু আপনি এত উত্তেজিত কেন?'

মিলান কিছুক্ষণ তাকাল, 'আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চান?'

'আমি? অদ্ভুত ব্যাপার?'

'কদিন থেকে আপনি আমাকে ফোন করছেন যে ছবিগুলো আপনার কাছে আছে। লালম ছবিগুলো আপনাকে বিক্রি করে দিয়েছে। আমি লালমকে জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু ও অস্বীকার করেছে। অস্বীকার করেছে কিন্তু দেখাতে পারেনি ছবিগুলো।'

'আপনি ভুল করছেন।'

'তার মানে?'

'আমি আপনাকে কখনই ফোন করিনি।'

'মিথ্যে কথা।'

'আমি গতপরশু প্রচণ্ড বৃষ্টির পরে এই শহরে এসেছি।'

মিলান অদ্ভুত চোখে তাকাল। আর নীলের মনে হল এমন সুন্দর মেয়ে এত গভীর চাহনির মেয়ে কোন অন্যায় করতে পারে না। কিন্তু মনে হওয়াটাই জীবন নয়। এই সময় ড্রাইভার বলল, 'মিসিবাবা, গাড়ি অন্য জায়গায় রাখতে হবে। জ্যাম হয়ে যাচ্ছে।'

মিলান ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলে ড্রাইভার উঠে বসল। স্টার্ট নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাব?'

'কোন ফাঁকা জায়গায়।'

ভিক্টোরিয়ার উল্টোদিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার নেমে না যাওয়া

পর্যন্ত মিলান কোন কথা বলল না।

'ঘড়িটা আমাকে পাঠালেন কেন?'

'যদি আপনার হয় তা হলে উপকার হবে।'

'আমার হতে যাবে বলে কেন মনে হল?'

'ঘড়ির ব্যান্ড ছিঁড়ে গেছে টানাহ্যাঁচড়ায়। আর আপনার বাম হাতের কব্জিতে ব্যান্ডেড লাগানো রয়েছে। তাই মনে হলো আপনার হতেও পারে।'

'কোথায় পেয়েছেন ঘড়িটা?'

'যেখানে ফেলে এসেছিলেন।'

'আমি কোথাও ফেলে আসিনি। আমার অজান্তে পড়ে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, একথা ঠিক।'

হঠাৎ মিলান এগিয়ে এল, 'আপনি কত টাকা চান?'

নীল তাকাল। নেহাৎই বাচ্চা মেয়ে।

'আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না আপনার টাকার দরকার নেই। যেরকম উদাসীন ভাব আপনি দেখাচ্ছেন আদৌ তা নন।' মিলান দাঁতে দাঁত চাপল।

'আপনি আমাকে কেন টাকা দেবেন?'

'এই ঘড়ির গপ্পোটা চেপে যাওয়ার জন্যে।'

'লালমের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ছিল?'

'আমরা বন্ধু ছিলাম।'

'আপনার স্ট্যাটাসের সঙ্গে ওর কোন মিল ছিল না।'

'আপনি ওকে চিনতেন?'

'না। গত সন্ধ্যের আগে দেখিনি।'

'কোথায় দেখলেন?

'এই প্রশ্নের জবাব পাবেন না। কিন্তু লালম আপনার বন্ধু হতে পারে না।'

'একবার দেখেই বুঝে গেলেন?'

'ওর প্রচুর মেয়েবন্ধু ছিল।'

'হু কেয়ার্স!'

'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। আপনার বাবা আপনাকে নিয়ে বিব্রত।'

'হয়তো। নিয়ম মানতে মানতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। লালমই আমাকে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছিল।'

'তাহলে ও খুন হল কেন ?'

'আমি কি করে জানব সেই উল্কিওয়ালা লোকটা কেন খুন করল ?'

'উল্কিওয়ালা লোক ?'

'হ্যাঁ। আজ কাগজে দিয়েছে।'

নীল শক্ত হল। সে দেখল কথাটা বলার সময় মিলান যেন একটু স্বস্তি পেল। সে নড়েচড়ে বসল, 'মিলান, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনাকে সাহায্য করতে চাই।'

'তার মানে ?'

'গত সন্ধ্যেবেলায় আপনি লালনের ফ্ল্যাটে ছিলেন। লালম পরে গিয়েছিল। সেখানে কোন ব্যাপার নিয়ে আপনাদের মধ্যে ঝামেলা হয়। আপনি এত রেগে যান যে কোন ভারি জিনিস দিয়ে লালমের মাথায় আঘাত করেন। সেই অবস্থায় বেরিয়ে আসার সময় লিফটম্যান আপনাকে দেখে হেসেছিল। লোকটা বেঁচে থাকলে এতক্ষণ পুলিশ আপনাকে বাইরে রাখত না।'

'কে বলল এসব কথা আপনাকে ?'

'আপনি মাথায় ঘোমটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন ওই বাড়ি থেকে। মিলান, আমার কাছে লুকিয়ে কোন লাভ নেই। সব কথা খুলে বলুন, তাতে ভালই হবে।'

'আপনিই সে-ই উল্কিপরা লোক ?' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল মিলান।

'তার সঙ্গে এই দুটো খুনের কোন সম্পর্ক নেই।'

'আলবৎ আছে। লিফটম্যানকে খুন করল কে ?'

'সামওয়ান যে আপনার পেছনে লেগে আছে।'

'আমার পেছনে ?

'হ্যাঁ।'

মিলান হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢাকল। ওর শরীর কাঁপছিল। নীলের খুব ইচ্ছে করছিল ওর কাঁধে হাত রাখতে। কিন্তু সে দূরত্ব রাখল। তারপর বলল, 'আপনি চলে আসার পর আমি লালমের ঘরে গিয়েছিলাম। তখন সে মৃত। আর তার মৃতদেহের পাশে ঘড়িটা পড়ে ছিল। আমি না নিয়ে এলে ওটা পুলিশের হাতে যেত।'

মিলান হাসল, 'আর ঘড়িটা দেখেই পুলিশ বুঝে যেত কার ঘড়ি ?'

নীল বলল, 'আপনি তর্ক করতে পারেন কিন্তু ঘটনাটা অস্বীকার করতে

পারেন না।'

মিলান বেঁকে বসল, 'আমি অস্বীকার করছি।'

'তাহলে আজ আমার কাছে এলেন কেন ?'

'দেখছি এসে ভুল করেছি।' মিলান জিজ্ঞাসা করল, 'ঘটনাটা কখন ঘটল ?'

'কোন্ ঘটনাটা ?'

'লিফটম্যানের ?'

'আমি জানি না। সম্ভবত আপনি চলে যাওয়ার আধঘণ্টা বাদে।'

'এমন করে বলছেন যেন আপনি করেননি।'

'ঠিকই।'

'পুলিশ বিশ্বাস করবে ? গতরাত্রে আপনার হাতে আমি উল্কি দেখেছি। আজ সকালে মা-বাবার সঙ্গে আপনাকে নিয়ে আলোচনা করেছে। এমন হতে পারে ফিরে গিয়ে দেখবেন পুলিশ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আপনার বাবা মা আমাকে নিয়ে কেন আলোচনা করেছেন ?'

'আপনার ওই উল্কিটা কাল ওদেরও নজরে পড়েছে।'

নীল চোখ বন্ধ করল।

মিলান বলল, 'শুনুন আমার কোন সাক্ষী নেই। পুলিশকে বললেও তারা প্রমাণের অভাবে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ঘড়িটা পেয়েছি বলেই মনে হল আমার উচিত আপনাকে সাবধান করে দেওয়া।'

'আপনি ভুল করছেন। পুলিশ আপনাকে জড়িয়ে ফেলবে।'

'কিভাবে ?' তীক্ষ্ন হল মিলানের গলা।

'আপনার ছবি পাবে ওখানে।'

'একজন ফটোগ্রাফারের কাছে অনেকের ছবি থাকতেই পারে।'

'পারে। কিন্তু ছবিগুলো কি অবস্থায় তোলা তা আপনি ভাল জানেন।'

কথাগুলো শোনামাত্র মুখ শুকিয়ে গেল মিলানের। সেটা লক্ষ্য করে নীল বলল, 'প্লীজ এটা শুনে মনে করবেন না ছবি সংক্রান্ত কোন ফোন আপনাকে আমি করেছি। ছবিগুলোর কথা আমি জানতে পারি পরশুদিন।'

'ওগুলো কোথায় আছে ?' মিলান কাঁপা গলায় জানতে চাইল।

'লালমের কাছে থাকা উচিত।'

'না নেই। আমি ওর সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।'

'ও কি বলল ?'

'অস্বীকার করেছে। বলেছে ছবিগুলো খুঁজে পাচ্ছে না।'

'লোকটা টাকার জন্যে আপনার ছবি বিক্রী করেছে।'

'কার কাছে?'

'সেটা খোঁজ নিতে হবে।'

'আপনি আমার ছবিগুলো উদ্ধার করতে পারবেন?'

নীল হাসল, 'চেষ্টা করতে পারি।'

মিলান সোজা হয়ে বসল, 'আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আমিও আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'ঠিক আছে। হাত মেলান।' নীল হাত বাড়িয়ে দিল।

মিলান সেটা উপেক্ষা করল, 'তার আগে আমাকে জানতে হবে এসবের সঙ্গে আপনি কিভাবে জড়ালেন? আপনার ইন্টারেস্ট কি?'

'প্রথম আলাপে আপনাকে সব বলব তা কি করে ভাবছেন?'

'ঠিক আছে, ওটা দ্বিতীয় আলাপের জন্য তোলা থাক। কিন্তু আমি আপনাকে সাজেস্ট করছি ওই হোটেলে না যেতে।'

'আমি যে ওখানে থাকি পুলিশ তা কি করে জানবে?'

'আমি জানি না।'

'তাহলে আগে ওখানে একটা টেলিফোন করব।'

'তারপর কোথায় থাকবেন?'

'আমি জানি না। দেখি অন্য কোন হোটেলে—।'

'সেটা সমস্যার সমাধান নয়। হোটেলে ওই উল্কি কতদিন চেপে রাখবেন? তাছাড়া আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকা দরকার।'

'কি করে সম্ভব?'

মিলান ড্রাইভারকে হাত নেড়ে ডাকল। সে আসতেই হুকুম করল কাছের টেলিফোন এক্সচেঞ্জে নিয়ে যেতে। ওই পথটুকু সে কথা বলল না। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে গাড়ি থামতে নীল নেমে পড়ল। মেয়েটার কথা অবিশ্বাস করার কোন যুক্তি নেই। এই সাবধানতাটুকুর প্রয়োজন আছে। সে একটা বুথে ঢুকে খেয়াল করলো হোটেলের নম্বরটি তার জানা নেই। চেয়েচিন্তে টেলিফোন ডাইরেক্টরি যোগাড় করে নম্বর দেখে নিয়ে সে ফোন করতেই রিঙ শুরু হল। তারপরে যে গলা কানে এল সেটা জ্যাকির।

খুব কায়দা করে হেলো বলল জ্যাকি।

নীল বলল, 'জ্যাকি, আমি নীল। পাঁচ নম্বর রুম।'

'ইয়েস স্যার। আই অ্যাম জ্যাকি।'

'বুঝেছি। আমার খোঁজে কেউ এসেছিল ?'

'নো স্যার।'

'টেঁডিলাল কোথায় ?'

'মালিক মার্কেটে গেছে।'

'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে জ্যাকি। করবে ?'

'ইয়েস স্যার।'

'আমার সুটকেস আর ব্রিফকেসটা নিয়ে এখনই চলে আসতে হবে। আমাকে আজই দিল্লী যেতে হবে। তোমার হাতে টেঁডিলালের টাকা দিয়ে দেব। তোমারও লাভ হবে।'

'আপনি চলে যাচ্ছেন স্যার ?'

'হ্যাঁ। আর্জেন্ট কাজ। এখন এত ব্যস্ত আছি যে নিজে যেতে পারছি না।'

'কোথায় নিয়ে যেতে হবে স্যার ?'

'তুমি ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টের সামনে চলে এস।'

'কাউকে কিছু বলব না স্যার ?'

'না। ফিরে গিয়ে টেঁডিলালকে টাকা দেবে।' নীল বলল, 'আমি আধ-ঘণ্টার মধ্যে ওখানে পেঁ'ছে যাচ্ছি।'

টেলিফোন রেখে নীল রুমালে মুখ মুছল। এখন একমাত্র মিলান এবং ওদের ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ তার হোটেলের খবর জানে না। অবশ্য ড্রাইভারের কাছ থেকে মিস্টার যোশী খবরটা বের করে নিতে পারে। গত রাত্রে তিনিই তো গাড়ি পাঠিয়েছিলেন হোটেলে। যদি জ্যাকি সুটকেস নিয়ে আসতে পারে তাহলে সে কোথায় উঠবে ? অন্য যে কোন হোটেল মানে খরচ বাড়বে। সঞ্চয় কমে আসছে। তাছাড়া এখন যে কারণে সে কলকাতায় থাকবে সেই কারণটার জন্যে কি করে কাজ করা যায় ? হ্যাঁ, এই মুহূর্তে সে মাদ্রাজ অথবা বোম্বে চলে গেলে অন্য কোন জাহাজি কোম্পানিতে কাজ জুটিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সেটা করলে একটি মেয়ে আর কোনদিন অন্ধকার ঘর থেকে বের হবে না।

গাড়ির কাছে আসতেই নীল দেখল মিলান ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা দিয়ে যারাই যাচ্ছে তারাই মিলানকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। মিলান

জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

'এখনও কেউ আমার খোঁজে যায়নি।'

'গুড। আপনার ব্যাগেজ ?'

'একজন নিয়ে আসছে।

'কোথাও থাকার জায়গা আছে ?'

'না। সেটাই ভাবছি।'

হাতব্যাগ খুলে একটা চাবি বের করল মিলান, 'সল্ট লেক চেনেন ?'

'না। শুনেছি, কখনও যাই নি।'

'একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যান। ব্লক বিডি, নাম্বার জিরো বাই টু। বাড়িটায় কেউ থাকে না। ড্রাইভারের সামনে বেশী কথা বলতে চাই না। ফিরে যাওয়ামাত্র বাবা যখন জানতে চাইবে কাল ও কোথায় আপনাকে নামাতে গিয়েছিল তখনই সব বুঝতে পারবে। লোকটার ব্যবহার পাল্টে যেতে পারে তখন। দেখা যাক। গুড বাই।' চাবিটা ধরিয়ে দিয়ে মিলান গাড়িতে উঠে বসতেই সেটা বেরিয়ে গেল।

হাতের মুঠোয় একটা দামী তালার চাবি। কোন রিঙ নেই। এমন একটা খালি বাড়ি মিলানের মত অল্পবয়সী মেয়ে পেল কোথায় ? সে মাথা নাড়ল। এসব নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই। আগে জ্যাকির কাছ থেকে জিনিসপত্র নেওয়া যাক।

ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছে নীল অবাক। জ্যাকি নয়, টেডিলাল দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। টেডিলালের হাতে অমিতাভর সেই ব্রিফকেসটা। দেখা হওয়ামাত্র টেডিলাল তাকে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল, 'তুমি আমার কাছে কিছু চেপে যাচ্ছিলে বলে সন্দেহ হচ্ছিল। জ্যাকিকে মালপত্র নিয়ে এখানে আসতে বলেছ কেন ?'

'পুলিশ আমার পেছনে লাগতে পারে।' নীল জবাব দিল, 'আমি জ্যাকিকে বলেছি কারণ আপনি টেলিফোন ধরেননি। এও বলেছি আপনার হোটেলের চার্জ আমি ওর হাতে গিয়ে দেব।'

'সেটা শুনেছি। কিন্তু কি করেছ তুমি যে আসামাত্র পুলিশের ভয়ে তোমাকে পালিয়ে যেতে হচ্ছে ?' টেডিলাল সরাসরি প্রশ্ন করল।

'আপনি বুঝবেন না।'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি এখানকার ওসি হিটলারের চেয়েও খারাপ

লোক। আজ সকাল থেকে তিনবার ফোন করেছে। তুমি এলেই যেন পাঠিয়ে দিই।'

'কেন?'

'তোমার হাতে মাছের উল্কি আছে ও জানতে পেরেছে।'

'তাতে কি হল?' নীল ইচ্ছে করেই জানতে চাইল।

'আমি জানি না? পুরনো দিনের কথা ভেবে তোমার জন্যে মন একটু নরম হয়েছিল আমার। একটা উপদেশ দিই, যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও।'

'ধন্যবাদ। আমার মালপত্র জ্যাকির নিয়ে আসার কথা ছিল।'

'আনতে পারেনি। গেটের সাদা পোশাকের পুলিশ বসে গেছে। এই ব্রিফকেসটা নিয়ে এসে আমাকে বলল পেঁছে দিতে। ওর হাতে এটা দেখলে পুলিশ সন্দেহ করত।'

'আপনি এটাকে খুলেছেন?'

হঠাৎ টেডিলাল অন্যরকম চোখে তাকাল, 'ওহে ছোকরা, পৃথিবীটা শুধু ফুর্তি লোটার জায়গা নয়। এখানে যেমন পাওয়া যায় তেমনি দিতেও হয়। হ্যাঁ, খুলেছি। কি নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটব তা না জেনে স্বস্তি পাইনি। কতগুলো ল্যাংটো মেয়ের ছবি ছাড়া তো এর মধ্যে কিস্যু নেই। ভেবেছিলাম ছিঁড়ে ফেলে দেব কিন্তু ভাবলাম মানুষের ফুর্তি তো অনেক রকম হয়।'

ব্রিফকেসটা হাতে নিল নীল, 'ধন্যবাদ। কত দিতে হবে?'

'তোমার জামা প্যান্ট জিনিসপত্র কোথায় ছিল?'

'সুটকেসে।'

'ওটাকে সরিয়ে আমার ঘরে রেখেছি। পুলিশ যদি সন্দেহ করে নিয়ে না যায় তো পরে যোগাযোগ করো, ফেরত পাবে।'

'আবার ধন্যবাদ। কত দিতে হবে?'

'এখন তো তোমার পকেটে দ্বিতীয় রুমালও নেই। ওগুলো ওই টাকায় কেনাকাটা করো। সুটকেস নেবার সময় হোটেলের চার্জ মিটিয়ে দিও।' টেডিলাল আচমকা হাঁটা শুরু করল। তাজ্জব হয়ে গেল নীল। সে কৃতজ্ঞ চোখে টেডিলালের চলে যাওয়া দেখল। ছেলেবেলায় ওরা ওকে দেখে চিৎকার করত, 'লালে লাল টেডিলাল।' তিনটে শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করল আবার, এই বয়সে।

ট্যাক্সিওয়ালা ওকে কলকাতার পাশ দিয়ে ঠিক সল্টলেকে পেঁছে দিল। এরকম ফাঁকা ফাঁকা সুন্দর বাড়ির শহর যে কলকাতায় দেখতে পাবে তা কখনও কল্পনা করেনি নীল। মানুষজন কম। বিদেশের পাড়াগুলোর মত। বিডি ব্লকে পেঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল সে। স্যুটকেস যখন সঙ্গে নেই তখন ট্যাক্সিওয়ালাকে বাড়িটার সামনে নিয়ে গিয়ে কি লাভ! ব্রিফকেস হাতে নিয়ে বাড়িটার নম্বর খুঁজছিল সে। এখন এই সকাল পার হওয়া সময়টায় রাস্তায় একটাও লোক নেই যাকে জিজ্ঞাসা করে হদিস পাওয়া যায়। মিনিট দশেক চলে যাওয়ার পর সে ঠিকঠাক বাড়ির সামনে পেঁছাল। গেট রয়েছে, একপাশে প্যাসেজ। একটু ফুলের গাছ যা অযত্নে পড়ে আছে। বাড়ির সব দরজা জানলা বন্ধ।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে চাবি ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। অনেককাল বন্ধ থাকলে বাড়িতে যে গুমোট গন্ধ তৈরি হয় সেটা নেই। তার মানে এই বাড়িতে মাঝেমধ্যেই লোক আসে। বাড়ির মালিক বিত্তবান। কার্পেট এবং জিনিসপত্রে তার প্রমাণ ছড়ানো। মিলান তাকে কার বাড়িতে পাঠাল। যার বাড়ি হোক চাবি তো মিলানের কাছে ছিল। শোওয়ার বসার ঘর মিলিয়ে পাঁচটা। একতলা বাড়ি। কিচেনে ঢুকে ফ্রিজ খুলে সে বেশ কিছু কাঁচা খাবার দেখতে পেল। অর্থাৎ মানুষ এখানে থাকে। নিয়মিত না হলেও থাকে। সেই মানুষ আজ এলে তাকে দেখে কি বলবে?

কি মনে হতে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল না নীল। কোণার একটা ঘরে ঢুকে জুতো খুলে ব্রিফকেসটাকে খাটে রাখল। বেসিনে মুখ ধুয়ে নিতেই টের পেল বেশ খিদে পাচ্ছে। ফ্রিজের খাবার রান্না করে নেবার বাসনা এখন ওর নেই। সে চটজলদি খাবার খুঁজল। এইসময় সে সেলারটা দেখতে পেল। বড়-ঘরের এক দেওয়ালে। সেখানে আশ্চর্য ব্যাপার, সব বিদেশি হুইস্কি, জিন ভোদকার সহাবস্থান।

একটুও দেরি না করে সে একটা গ্লাসে অনেকটা হুইস্কি ঢেলে জল

মিশিয়ে নিল। গলা দিয়ে বস্তুটা যখন নামছিল তখন পেটে একটু অস্বস্তি হলেও ধীরে ধীরে টান টান হয়ে থাকা নার্ভগুলো শিথিল হয়ে এল। যেখানে যা ছিল ঠিক তেমনি রেখে কোণের ঘরে চলে এল নীল। আর তখনই টেলি-ফোনটা বাজল।

টেলিফোন বাজছে মাঝখানের ঘরে। অদ্ভুত কুঁই কুঁই শব্দ বেরুচ্ছে যন্ত্র থেকে। যেন একটা বাচ্চা কুকুর কাঁদছে। এখানে কারো আসার কথা ছিল নাকি? বাড়িটা যখন খালি তখন খামোকা কেউ ফোন করবে কেন? হয় রং নাম্বার নয় মিলান! কিন্তু সে রিসিভার তোলার ঝুঁকি নিতে পারে না। যত ইচ্ছে বেজে যায়, বাজুক।

নীল খাটে শরীর এলিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল। এখন তার কি করা উচিত! অতি উৎসাহে রাস্তায় পড়ে থাকা দড়িটাকে তুলে সে নিজেই গলায় পরতে যাচ্ছে। পুলিশ একটু বাদেই তার পরিচয় জানতে পারবে। নীল, হাতে উল্কি, জাহাজে কাজ করে। ব্যাস এইটুকু। তার চেহারার বিবরণ হয়তো পুলিশ পাবে কিন্তু তার কাছে পেঁছাবে কি করে? আচ্ছা, উল্টোটা যদি হয়! সে পুলিশের কাছে পেঁছে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে যদি বলে তা হলে? তার কথা পুলিশ যে অবিশ্বাস করবেই এমন ভাবার কি কারণ আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল এসব খুন হবার আগে থেকেই পুলিশ একজন আগন্তুকের খোঁজ করছিল বলে টেডিলাল তাকে জানিয়েছিল। যদি সেই আগন্তুক মানে তার কথা হয় তা হলে এর পেছনে ম্যাডামের হাত থাকতে পারে। তিনিই পুলিশকে পরামর্শ দিয়েছেন। আর সে ক্ষেত্রে ম্যাডামের বিরুদ্ধে কোন কথাই তো সে পুলিশকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। নীল নিঃশ্বাস ফেলল। তার টাকার দরকার। আর তা দিতে পারে মিলান।

হ্যাঁ, মিলান। বিশাল বড়লোক মিস্টার যোশীর মেয়ে মিলান যোশী। কিন্তু কিভাবে টাকাটা বের করতে হবে সেটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা দরকার।

অন্ধকার সমুদ্রে কেউ ডুবে যাচ্ছে। ডুবে যাওয়ার আগে দু'হাত বাড়িয়ে তার কাছে কাতর আবেদন করছে বাঁচবার জন্যে, এমন একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নীল। এবং তখন কানে এল, 'কি হল, ঘুম ভাঙল ?

নীল দেখল, ঘরের এককোণের চেয়ারটায় পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে মিলান। তার মানে এই মেয়ের কাছে বাড়িতে ঢোকার আরও চাবি আছে। এখন মিলানের গায়ে হলুদ মিনি ফ্রক। হাঁটুর অনেকটা ওপর পর্যন্ত জোড়া শঙ্খসাপের খেলা। চোখ টানছিল, নীল নিজেকে সহজ করার জন্যে বলল, 'কখন এলেন ?'

'অনেকক্ষণ। ঘুমোচ্ছেন বলে ডিস্টার্ব করিনি।' মিলান হাসল।

ঘড়িতে এখন তিনটে বাজে। একটা বড় পেগ হুইস্কি কখনও কখনও মারাত্মক কাজ করে। এখন খিদে বোধটাই নেই। নীল উঠে টয়লেটটা থেকে ফিরে এল। সেই একইভাবে চেয়ারে বসে ছিল মিলান। বলল, 'এর মধ্যে কয়েকটা ব্যাপার হয়েছে। আমার ড্রাইভারের স্টেটমেণ্ট অনুযায়ী পুলিশ আপনার হোটেলে গিয়েছিল। তারা নাকি আগেই এমন সন্দেহ করেছিল। বিফল হয়ে পুলিশ খুব খেপে গেছে। তারা আপনাকেই খুনী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।'

নীল হাসল, 'চমৎকার !'

চমকে তাকাল মিলান, 'আপনার নার্ভ দেখছি খুব শক্ত।'

'তারপর বলে যান।'

'আমার ড্রাইভার বুঝে গিয়েছে পুলিশকে যদি সে না বলে আজ সকালে আপনার সঙ্গে আমি অনেকটা সময় কাটিয়েছি এবং তারপর হোটেলে ফিরে যাননি বলেই পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারেনি তা হলে সে আমার কাছ থেকে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। যে লোকটা আমার মুখের

দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস পেত না সে এবার ফণা তুলবেই।' মিলান একটানা বলল।

'কি করতে চান আপনি?'

'টাকা খুব খারাপ জিনিস। বিশেষ করে চাপ দিলে যে টাকা আসে। একবার পেলে বারবার পেতে ইচ্ছে করে। লালম তার উদাহরণ।'

'বুঝলাম না।'

'আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন লালমের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ছিল। ওয়েল, আমি ওকে ভালবাসতাম। ওর সঙ্গে আমার স্ট্যাটাসের মিল নেই, পড়াশুনাও বেশি নয় কিন্তু ওর মধ্যে এমন একটা পুরুষালি ব্যাপার ছিল যে না ভালবেসে পারিনি। ওকে আমার বাড়ির কেউ মানতে পারবে না জেনেও কেয়ার করিনি। শেষে ও যখন ছবির জন্যে ওর ফ্ল্যাটের ছাদে নেকেড হতে বলল তাও হয়েছি। আমি ভালবেসেই করেছি এসব। ছবিগুলো তোলার পরই সব বদলে গেল। ও বলল, কেউ একজন আমার ছবির জন্যে ওর কাছে এক লক্ষ টাকায় প্রস্তাব দিয়েছে। ওর নাকি টাকার দরকার। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমি ওই সব ছবি তুলেছি মজার জন্যে। মজাটা আমার আর লালমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলে জানতাম। কিন্তু ও ছবিগুলো বিক্রি করে দেবে? অনেক আবেদন করলাম, কান্নাকাটিও। শুনল না। বলল, আমি যদি টাকাটার ব্যবস্থা করি তা হলে ও বাইরের কাউকে বিক্রি করবে না। আমার বাবার প্রচুর পয়সা। কিন্তু চাইলেই তিনি এক লক্ষ টাকা দেবেন না। অনেক প্রশ্ন করবেন। মা চোখ কপালে তুলবে। হঠাৎ খেয়াল হল আমাদের দুই বোনের নামে বাবা আলাদা করে বিভিন্ন জায়গায় সার্টিফিকেট ডিপোজিট রেখেছে। ওগুলো ম্যাচিওরড হবার আগে তোলা যায় না বলে জানতাম। কিন্তু লালম বলল ধারণাটা ঠিক নয়। ম্যাচিওরড না হবার আগে তুললে টার্মস অনুযায়ী ইন্টারেস্ট পাব না। আমার একার নামে যেগুলো সেগুলো তুলতে পারি। লালমের সঙ্গে গিয়ে তুললাম একটা এক লাখ টাকার ডিপোজিট। টাকাটা ওকে দিয়েও দিলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম বাবা যেন জানতে না পারে আর ছবিগুলো ফেরত পাই। বাবা এখনও জানেনি কিন্তু ছবিগুলো পেলাম না।'

নীল দেখল কথা থামিয়ে মিলান চোখ বন্ধ করল। সে নিচুগলায় বলল, 'হয়তো ছবিগুলো লালম বিক্রি করে দিয়েছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল মিলান, 'কাকে ?'

'আমি জানি না ।'

'আমাকে জানতে হবে। যার কাছে ছবি আছে সে আমাকে, আমার বাবাকে সারা জীবন ব্ল্যাকমেইল করতে পারে। উঃ, কি ভুল আমি করেছি ।' মিলান ঠোঁট কামড়াল আফশোষে এবং নীলের মনে হল সে আরও সুন্দর হয়ে উঠল।

নীল বলল, 'অপেক্ষা করুন, গরজ যার সে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেই ।'

'হ্যাঁ, তখন আমার কিছু করার উপায় থাকবে না ।'

নীল হাসল, 'হয়তো আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন । ছবিগুলো, এমনও হতে পারে, এই মুহূর্তে তেমন কোন লোকের হাতে পড়েনি ।'

'লালমকে আমি হাজারবার প্রশ্ন করেছি সে উত্তর দেয়নি। দিলে মিথ্যে বলেছে। টাকা নিয়েও আমাকে ছবি বা নেগেটিভ ফেরত দিতে পারেনি। উল্টে কাল আমাকে শাসাল তার আরও এক লক্ষ দরকার, আমাকে এনে দিতে হবে। আমি রাজি না হওয়ায় সে এমন একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করেছিল যে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। কিন্তু ভারী ফুলদানিটা দিয়ে আঘাত করার সময় আমি কল্পনাও করিনি এমন হবে। ও পড়ে গেছে দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিলাম। সামনে লিফট ছিল না বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলাম। ভয় হচ্ছিল কেউ আমাকে দেখে ফেলবে। তাই ঘোমটা দিয়েছিলাম। আচ্ছা, এ সব কথা পুলিশকে বললে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে, না ? বড় বড় চোখে মিলান তাকাল নীলের দিকে। বড্ড ভাল লাগল। নীল মাথা নাড়ল, 'কি দরকার বলার। আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমি লালমের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম লিফটে চড়ে ।'

'কেন ?'

'আপনার খোঁজে ।'

নীল মাথা নাড়ল, 'কেউ বিশ্বাস করবে না, টেলিফোনের ক্রস কানেকশনে আমি জানতে পেরেছিলাম কয়েকটা নগ্ন ছবির খুব ডিম্যান্ড হয়েছে। ছবি তোলা হয়েছে যেখানে তার কাছেই সাদা ন'তলা বাড়ি যার মাথার ওপরে বেলুন উড়ছে। মিলান, আমার খুব টাকার দরকার। একটি মানুষকে নতুন করে বাঁচানোর জন্যে টাকার প্রয়োজন। মনে হয়েছিল এর মধ্যে টাকার গন্ধ আছে। অনেক চেষ্টা করে আবিষ্কার করলাম কোন্ বাড়ির ছাদে ওই ছবি-

গুলো তোলা হয়েছিল। জানলাম ওর পাশেই ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাট। অতএব লালমের ফ্ল্যাটে পেঁাছে গিয়েছিলাম আমি।'

'তারপর ?'

'আমি পেঁাছাবার খানিক আগে আপনি বেরিয়েছেন। ঘোমটা মাথায় থাকায় আপনাকে আমি বুঝতে পারিনি। ঘরে ঢুকে দেখি লালম রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ভয় পেয়ে গেলাম। বেরিয়ে আসার আগে আপনার ঘড়িটা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিলাম। সেইসময় তৃতীয় মানুষটি লালমের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ওপরে উঠে আসছিল।'

'তৃতীয় মানুষ ?'

'হ্যাঁ, জনৈকা ম্যাডামের অনুচর। এই ম্যাডামের কথাই ক্রস কানেকশনে শুনতে পেয়েছিলাম আমি। ওকে এড়িয়ে নিচে নেমে গিয়েছিলাম আমি। আমার অনুমান মৃতদেহ দেখে লোকটা নিজেকে বাঁচাতে লিফটম্যানকে খুন করে গেছে।'

নীলের কথা শেষ হওয়ামাত্র মিলান উঠল। একটা বড় প্যাকেট থেকে কিছু খাবার বের করে নীলের সামনে ধরল, 'খেয়ে নিন।'

'ধন্যবাদ।' নীল খাবারের প্যাকেটটা নিল।

'এই ফ্ল্যাট আমাদের। শখে পড়ে বাবা কিনেছিলেন। কখনও আসার সময় পান না। এর দুটো চাবিই আমার কাছে আছে। আর একটা মায়ের কাছে। মা মনে হয় ফ্ল্যাটটার কথা ভুলেই গিয়েছেন। সল্টলেকে ফ্ল্যাট কিনতে মায়ের ইচ্ছে ছিল না। আমি মাঝে মাঝে আসি। দিনটা কাটিয়ে যাই।'

'কেন ?'

মিলান একদৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিল, 'ফুর্তি করতে।' তারপর হাসল।

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'কেন ?'

'যারা বারোয়ারি ফুর্তি করে তাদের মুখে একটা ছাপ এসে যায়।'

'তাই ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি তো জাহাজে কাজ করতেন। প্রতিটি বন্দরে ক'টা করে বউ রেখেছেন ?'

নীল হাসল, 'গোনার কথা তো মনে আসেনি।'

মিলান উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি। কাউকে জানান না দিয়ে এখানে থাকুন। কারো আসার সম্ভাবনা নেই। যদি হঠাৎ কেউ আসে তা হলে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে চলে যাবেন, তাকে দেখা দেবেন না। আসবে না অবশ্য। হ্যাঁ, আমার ফোন নাম্বার রেখে গেলাম রিসিভারের পাশে। খুব প্রয়োজন হলে করবেন। কাল দেখা হবে, বাই।' মিলান জুতোয় শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল।

মন দিয়ে খাবারগুলো শেষ করল নীল। জল খেয়ে মনে হল স্নান করা দরকার। সে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ভারি পর্দা সরাল। রাস্তাটা চমৎকার, কোন মানুষ নেই। মানতে হবে লুকিয়ে থাকার পক্ষে বাড়িটা আদর্শ। কিন্তু শুধু লুকিয়ে থাকলে তো তার চলবে না। বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে খেয়াল হল। স্নান সেরে তো এগুলোই পরতে হবে। মিলানকে বললে হত আর এক সেট পোশাক আনতে।

নীল ব্রিফকেসটার দিকে তাকাল। খাটের এক কোণে পড়ে আছে সেটা। টেনে নিয়ে ডালা খুলতেই চমকে উঠল নীল। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল। খামটা নেই। মিলানের ছবি এবং নেগেটিভ সমেত খামটা ব্রিফকেস থেকে উধাও হয়েছে। অথচ এই বাড়িতে ঢোকার সময়েও ওটা ব্রিফ-কেসে ছিল। সে যখন ঘুমাচ্ছিল তখনই মিলান ওটা সরিয়ে নিয়েছে। নিয়ে চুপচাপ বসেছিল। এতক্ষণ ধরে গল্প বলার সময়ে ওটা ওর ব্যাগেই ছিল। ছবিগুলো ফিরে পাওয়ার জন্যে যেসব কথা বলছিল তা বানানো এবং ছবি সম্পর্কে নীলের কথা শুনে নিশ্চয়ই মজা পেয়েছিল। যা ভেবেছিল তা নয়। মিলান মারাত্মক মেয়ে। অত্যন্ত অসহায়বোধ করল নীল। টাকা রোজগার করার একমাত্র অস্ত্র তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। সে জানলার কাছে সরে এল। তার হাত পা কাঁপছিল। মিলান কিভাবে ফিরে গেল? কোন গাড়ির আওয়াজ তো কানে আসেনি। যদি হেঁটে ট্যাক্সি খুঁজতে যায় তা হলে হয়তো দৌড়াদৌড়ি করলে এখনও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

নীল দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল। তার মন বলল, কোন লাভ হবে না। ছবিগুলো সঙ্গে নিয়ে মিলান সোজা পথে হাঁটবে না। সল্ট-লেকের যে কোন একটা গলিতে ঢুকে গেলে ওকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে। ও তাই যাবে।

সারাটা সন্ধ্যে অদ্ভুত খারাপ কাটল। সে আলো জ্বালতে পারছে না। নিজেকে কেমন ছিবড়ে বলে মনে হচ্ছে। অবিনাশদের বাড়িতে আজ একবার

যাওয়া উচিত ছিল। ওর মা নিশ্চয়ই ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। তা ছাড়া সেই অন্ধকার ঘরে একজন তার জন্যে অপেক্ষা করবেই। কিন্তু গিয়ে কি করতে পারত? কোন আশার কথা শোনাতে পারত না। টাকা চাই অথচ আর কোন রাস্তা তার সামনে খোলা নেই। কি গাধার মত সে ছবিগুলোকে ফেলে রেখেছিল!

নীল টেলিফোনটার দিকে তাকাল। এখন সাড়ে আটটা বাজে। সে কাছে পৌঁছে ডায়াল করল। রিঙ হচ্ছে। এবং তারপরেই টেডিলালের গলা, 'হ্যালো!'

নীল খুব নিচু গলায় বলল, 'নীল।'

'কোত্থেকে?' টেডিলালের উচ্চারণে সতর্কতা।

'সল্টলেক।'

'তাড়াতাড়ি কলকাতা থেকে সরে যাও। হিটলার এখন তোমাকে পাওয়ার জন্যে ক্ষেপে গিয়েছে। অ্যারেস্ট করতে এসেছিল।'

'তারপর?'

'ওই ঘরটা লণ্ডভণ্ড করে গেছে। আমাকে খুব শাসিয়েছে। পাশের বাড়ির সেই মেয়েটা হিটলারকে বলেছে তোমাকে আজ সকালে একটা বড় গাড়িতে উঠতে দেখেছে খালি হাতে। তা হলে তোমার জিনিসপত্র কোথায় গেল? বাধ্য হয়ে আমি তোমার স্যুটকেস ওকে দিয়ে দিয়েছি। বলেছি তুমি আমার কাছে রেখে গিয়েছিলে। অতএব দয়া করে এদিকে এসো না।'

'দরকার হলে ফোন করতে পারি?'

'হ্যাঁ, আমি না ধরলে কথা বলো না। ওকে?'

রিসিভার নামিয়ে রাখল নীল। মনে হল তার বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

ব্রিফকেসটাকে খাটের নিচে ঢুকিয়ে নিয়ে চারপাশে চোখ বোলাল নীল। না সে এখানে ছিল এমন কোন চিহ্ন নেই। নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে চাপ দিতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল সেটা। সল্টলেক এর মধ্যেই ঘুমন্ত। রাস্তার আলো ধাঁধিয়ে দিয়ে মাঝেমধ্যে এক-একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। নীল দেখে নীল চাবিটা পকেটে নিয়েছে কি না।

হঠাৎ তার মনে একটা আশঙ্কা জেগেছে। যে মেয়ে চোরের মত ব্রিফকেস থেকে ছবি নিয়ে যেতে পারে সেই মেয়ে যে পুলিশকে তার লুকিয়ে থাকার আস্তানার হদিশ দিয়ে দেবে না তার স্থিরতা কোথায়? অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে সে চাবি পেল কি করে? তবু বাড়িতে ইঁদুরের মত ধরা পড়তে নীল চায় না। তা ছাড়া ঘরে বসে সে হাঁপিয়ে পড়েছিল। ওয়ে টু ক্যালকাটা লেখা রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই সে বাস পেয়ে গেল।

অবিনাশের খবর পুলিশ নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি পাবে না। তার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি ছিল আবিষ্কার করে ওদের বাড়ির সামনে লোক রাখার কথা হিটলারমশাই নিশ্চয়ই ভাবতে পারবেন না। গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নীলের মনে হল এটা হিটলারেরই জুরিসডিকশন। এখানে তাকে ধরতে পারলে লোকটা নিশ্চয়ই ছাল ছাড়িয়ে নেবে।

দরজা খুললেন অবিনাশের মা, 'ও তুমি! আমি ভাবছিলাম তুমি এলে না।'

'একটু দেরি হয়ে গেল।' নীল ভেতরে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের ঘর থেকে গলা ভেসে এল, 'কে মা?'

'নীল।' বৃদ্ধা জবাব দিলেন। কিন্তু আজ ওঁকে অনেক স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।

নীল জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ বাবা। উনি খুব অবাক হয়েছেন।'

'অবাক কেন ?'

'অনেক দিনের পরিচিত ডাক্তার তো, আমাদের অবস্থা জানেন। তা চেম্বারে বসে যখন কথা বলছিলাম তখন একটা মজা হয়েছে।'

'কিরকম ?'

'ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন এত খরচ কি করে করবেন ? তখন আমি তোমার কথা বললাম। ওঁর কাছে লুকিয়ে তো কোন লাভ নেই। বললাম তুমি অবিনাশের বন্ধু ছিলে, মেয়ের সঙ্গেও একটা সম্পর্ক আছে। জাহাজে চাকরি কর। এখন ছুটিতে এসেছ। এ পাড়ায় মানুষ হয়েছ। তুমি নিজে থেকে খরচ করতে চাইছ।'

'তারপর ?'

'ওখানে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি বললেন, এরকম তো দেখা যায় না। জাহাজীদের মন খুব উদার হয়। তুমি কোথায় থাকো জানতে চাই-ছিলেন। আমি বলতে পারিনি। সেই লোকটা বলল তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। ও হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করছিল তোমার হাতে উল্কি আছে কি না, জাহাজীদের নাকি থাকে।'

পৃথিবীটা টলতে লাগল পায়ের তলায়। নীল নিঃশ্বাস বন্ধ করল, 'কি বললেন ?'

বললাম, 'অন্ধকারে ভাল করে লক্ষ্য করিনি। তুমি হাতে উল্কি আঁকিয়েছ নাকি ?'

মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু বলতে হল।

অবিনাশের মা বললেন, 'ডাক্তারবাবু আগামী পরশু তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন সন্ধ্যের সময়। উনি সব খবর নিয়ে রাখবেন। চা খাবে ?'

'আপনার যদি অসুবিধে না হয় !'

'না না অসুবিধে কি ! তুমি ও-ঘরে বসো, আমি আসছি।'

নীল পাশের ঘরের দরজায় এল। ঘর অন্ধকার।

'কি হয়েছে ?' গলার স্বরে যেন উদ্বেগ।

'কি ব্যাপারে ?' নীল অবাক হল।

'মা কি বলছিল ?'

'ও কিছু না। কেমন আছ ?'

'আছি।' নিঃশ্বাস পড়ল।

'আমি এসেছি বলে তুমি খুশি হওনি ?'

'একথা মনে হল কেন ?'

'আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলছ না !'

'তুমি কেমন আছ ?'

'আমি ?' চমকে উঠল নীল। অন্ধকারের দিকে তাকাল।

'হুঁ।'

'আছি, ভাল আছি।'

'তোমাকে ভাল থাকতেই হবে।'

'কেন ?'

'না হলে আমি ভাল থাকব না।'

নীল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সল্টলেকে ফিরে আসতে এগারটা বেজে গেল। আগামী পরশু তাকে ডাক্তারের কাছে যে কথাগুলো বলতে হবে তার কোন জায়গাই এখনও তৈরি হল না। তা ছাড়া ডাক্তারের চেম্বারে যে লোকটি তার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছে সে যে কোন বিপদ ডেকে আনবে না এমন নিশ্চয়তা নেই। খামোকা উল্কির কথা তুলল কেন লোকটা। অদ্ভুত ভারী মন নিয়ে সল্টলেকে ফিরে এসে নীল দেখল বাড়িটার সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। অর্থাৎ মানুষ এসেছে। কে অথবা কারা ? মিলানের কথা অনুযায়ী এখানে সে ছাড়া আর কারও আসার কথা নয়। মিলান কি এত রাত্রে ফিরে এল ? সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। এক্ষেত্রে বাড়ির দিকে এগোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। খানিকটা দূরে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল নীল। গাড়িতে কেউ আছে। হ্যাঁ, ড্রাইভার। মিলানের সঙ্গে থাকা ড্রাইভারটা এমন মোটা নয়। এ অন্য লোক।

মিনিট পনেরো চলে গেল। এর মধ্যে দুটো গাড়ির হেডলাইট থেকে নিজেকে আড়াল করতে দু'-দুবার সরতে হয়েছে। এই অবস্থায় তাকে দেখলে যে কেউ সন্দেহ করবে। তার মনে হল মিলানও আসতে পারে। হয়তো মিলান তার জন্যে অপেক্ষা করছে আর সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যেতে সাহস হচ্ছিল না। এটা তো একটা ফাঁদও হতে পারে।

আরও পনের মিনিট গেল। নীলের ধৈর্য শেষ হয়ে আসছিল। বাড়িটার কাছে যাওয়ার কৌতূহল হচ্ছিল খুব। কিন্তু ড্রাইভারের চোখ এড়িয়ে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। আলোগুলো নিভতে লাগল। চারজন মানুষ বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। দরজাটা বন্ধ হল। চারজনের একজন মহিলা। বেশ মোটাসোটা। ওরা গাড়ির দিকে এগোচ্ছে। আধা-অন্ধকারে নীল মুখগুলো ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু শেষ লোকটা যখন গাড়িতে উঠছে তাকে

খুব চেনা মনে হল। যেভাবে লোকটা চারপাশে তাকাল মুখ দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও নীল আড়ষ্ট হয়ে গেল।

গাড়িটাকে বেরিয়ে যেতে দেখল সে পাথরের মত।

সেই লোকটা এ বাড়িতে এল কি করে? সঙ্গে যারা ছিল তারা কে? এ বাড়িতে ওদের কি প্রয়োজন ছিল? নীল এখানে আছে খবর পেলে ওর অপেক্ষায় আলো জ্বালিয়ে বসে থাকত না। ড্রিমল্যান্ড বার, রেসকোর্স, লালমের ফ্ল্যাট আর এই বাড়িতে লোকটা স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করছে। কেন?

আরও কিছুক্ষণ সময় চলে গেলে রাস্তা পেরিয়ে নীল গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। ওরা নিশ্চয়ই কাউকে ভেতরে রেখে যায়নি। নিঃসন্দেহ হবার জন্যে দু-তিনবার শব্দ করে দরজায় চাবি ঢোকাল নীল। ভেতরে ঢুকতেই হুইস্কির গন্ধ নাকে এল। সে অন্ধকারে চারপাশে তাকাল। এখনই কেউ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

মিনিটখানেক যাওয়ার পর ও পা বাড়াল। অন্ধকারেই এ-ঘর ও-ঘর করে বুঝল বাড়িতে কেউ নেই। চারজন তা হলে এখানে হুইস্কি খেয়েছে। সে সেলারের কাছে পেঁাছে পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালাল। যে বোতল থেকে সে হুইস্কি নিয়েছিল এখন সেটা একেবারে খালি, আর একটা নতুন বোতলের খানিকটা কমে গেছে।

মিলান বলেছিল, এ বাড়িতে কেউ আসে না। কথাটা মিথ্যে। হয় ও জানে না অথবা সত্যি বলেনি। নীল টেলিফোনের কাছে চলে এল। একটা মাঝারি টেবিলের একপাশে রকিং চেয়ার, অন্যদিকে সাধারণ। সিগারেটের তামাকের গন্ধ বাতাসে হুইস্কির সঙ্গে মিশেছে। নীল টেবিলল্যাম্পটা জ্বালতেই অ্যাশট্রে ওপচানো সিগারেটের শেষাংশ দেখতে পেল। ওরা অনেকক্ষণ ছিল। ভাগ্যিস সে আজ বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে।

নীল সামান্য ঘুরে রকিং চেয়ারে বসল। সামনেই একটা প্যাড। তাতে হিজিবিজি ছবি। কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে মানুষ অনেক সময় ওরকম করে। প্যাডটাকে টেনে নিতে তার মেরুদণ্ড কনকন করে উঠল। নিজের নামটা পাঁচরকম কায়দায় লেখা দেখতে পেল সে। নীল নীল নীল নীল নীল অ্যান্ড হিজ উল্কি।

ওরা এখানে বসে তাকে নিয়ে আলোচনা করছে। নীল ভাল করে দেখল। হাতের লেখা মেয়েলি। অথবা যিনি এসব লিখেছেন তিনি নির্ঘাৎ মহিলা।

কারণ প্যাডের অন্য ফাঁকা জায়গায় মেয়েলি আলপনা আঁকা। ছেলেদের হাত থেকে এমন আলপনা সচরাচর বের হয় না।

এই মোটা মহিলাটি কে? ইনিই কি সেই ম্যাডাম? ম্যাডাম যদি হন তা হলে তিনি এই বাড়িতে আসেন কোন্ সুবাদে! চকিতে মিসেস যোশীর মুখ মনে পড়ল তার। রেসকোর্সে ভদ্রমহিলা যেরকমটি ছিলেন নিজের বাড়িতে মুখোমুখি হয়ে সে রকম ব্যবহার করেননি। কেন? লালমের হত্যার কারণে তিনি কি বিব্রত ছিলেন। গাড়ির ভেতর থেকে নামার সময় কাউকে ডার্লিং বলেছিলেন। কে সে? মিসেস যোশীই কি ম্যাডাম?

মাথার ভেতরটা আচমকা জমে গেছে বলে মনে হত নীলের। অসম্ভব। মিসেস যোশী কেন নিজের মেয়েকে ব্ল্যাকমেইল করবেন? করলে তো সেটা মিলান জানতেই পারত। মিস্টার যোশীর সঙ্গে মিসেসের সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক নয়। রেসকোর্সে এবং বাড়িতে সেটা বোঝা গেছে। তবে কি মিসেস যোশী মেয়ের ছবি ব্যবহার করতে চান স্বামীর বিরুদ্ধে? কিন্তু ম্যাডাম হতে গেলে যে ক্ষমতার প্রয়োজন তা কি ভদ্রমহিলার আছে?

নীল কোন থৈ পাচ্ছিল না। তবে এখানে এই ঘরে বসে যে চারজন তাকে নিয়ে আলোচনা করেছে তার মধ্যে মিসেস যোশী ছিলেন। সে প্যাডের কোণে একটা টেলিফোন নাম্বার দেখতে পেল। কার নাম্বার? রিসিভার তুলে ডায়াল করতেই একটা ভারী গলা শুনতে পেল, 'ভান্ডারী স্পিকিং?'

'মিস্টার ভান্ডারী?' নীল কাঁপাগলায় কথা বলল।

'ইয়েস ইন্সপেক্টর ভান্ডারী, পার্ক স্ট্রীট পি এস।'

'মিসেস যোশীর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু হু আর ইউ।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল নীল। ভদ্রমহিলা ম্যাডাম হোন বা না হোন কিন্তু ভান্ডারী নামক হিটলারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। সে পকেট থেকে মিলানের দেওয়া কাগজটা বের করে নম্বর ঘোরাল। কাজের লোকদের কেউ রিসিভার তুলতেই সে মিস্টার যোশীকে চাইল। লোকটা জানাল সাহেব এখন ঘুমাচ্ছেন। নীল বলল, ব্যাপারটা এমন জরুরী যে ওঁকে ঘুম থেকে তোলা দরকার। লোকটা ইতস্তত করল। কিন্তু মিনিট তিনেক বাদে যোশী সাহেবের গলা পেল নীল।

'মিস্টার যোশী, এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।'

'আপনি কে ?'

'পরিচয় দেবার মত কিছুই নেই। মিসেস যোশী এখন কোথায় আছেন ?'

'আপনি কে বলছেন ?'

'সামওয়ান হু ডাজ নট ওয়ান্ট টু ডিসক্লোজ হিজ আইডেন্টিটি।'

'দেন গো টু হেল।'

'দাঁড়ান। আপনার স্ত্রী কি আপনার প্রতি বিশ্বস্ত ?'

'সে কি করছে তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। আপনার আগে ওকে ব্ল্যাকমেইল করে অনেক ফোন এসেছে। এতে আমার কিছু আসে যায় না। আমার কাছ থেকে একটা পয়সাও পাবেন না। গুড নাইট।' লাইন কেটে দিলেন ভদ্রলোক।

ব্যাপারটা কিছুটা সহজ হয়ে গেল। মিস্টার যোশীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কটা কেমন সেটা বোঝা যাচ্ছে। মিলানের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। টাকা রোজগারের যে রাস্তাটা খোলা ছিল ছবিগুলো উধাও হবার পর সেটাও বন্ধ। কিন্তু মিলানই তার একমাত্র আশা। এখনও।

নীল কিচেনে চলে এল। ফ্রিজে খাবার আছে। গ্যাস জেবলে সেগুলোকে একটা চেহারা দিল। তারপর হুইস্কির বোতল বের করে খাবার নিয়ে বসল অন্ধকার ঘরে। না, এমন খাওয়া কখনই উচিত হবে না যে হুঁশ চলে যায়। এ বাড়িতে আজ রাত্রেও সে নিরাপদ নয়।

ঘড়িতে যখন রাত একটা তখন টেলিফোনটা বেজে উঠল। তিনবারের বার ধড়মড়িয়ে জেগে নীল অন্ধকারে তাকাল। আচমকা ঘুম ভাঙায় বুঝতেই সময় সময় গেল কিছুটা। সে দেখল সোফাতেই আধশোয়া হয়ে রয়েছে। মদ্যপানের শেষদিকে নিশ্চয়ই তার চৈতন্য ছিল না।

টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। এত রাত্রে কে এখানে ফোন করবে ? কারও তো এখানে থাকার কথা নয়। এবার সে সাহসী হল। হয়তো অ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়া তখনও শরীরে ছিল বলেই হতে পারল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাতেই বিশ্বচরাচর নির্জন হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত নৈঃশব্দ্যের পর মিহি-গলা কানে এল, 'ঘুম ভাঙল ?'

মিলান। একটুও ভুল হল না গলার স্বর চিনতে। সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'আপনাকে জানাচ্ছি। ছবিগুলো আমি নিয়ে এসেছি।'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু আপনি মিথ্যে গল্প শুনিয়েছিলেন।'

'না। ছবিগুলো যদি ম্যাডামের ক্যারিয়ারের কাছ থেকে ম্যানেজ না করতে পারতাম তা হলে এতক্ষণে আপনার বাবার পকেট থেকে কয়েক লক্ষ বেরিয়ে যেত।'

'এসব গল্প আমি বিশ্বাস করি না।'

'টেলিফোন করেছেন কেন ?'

'ঘুম আসছিল না তাই। আমার বেডরুমে সেপারেট লাইন আছে।' মিলান হাসল, 'আচ্ছা, আমার ছবিগুলো আপনি দেখেছেন, না ?'

'হ্যাঁ।'

'কি রকম লেগেছে ?'

'ভাল।'

'ওঃ ডু ইউ থিংক আই ডিজার্ভ অনলি "ভাল" ?' রাগত গলায় বলল

মিলান, 'জাহাজে চাকরি করে আপনার চোখ মন সব নষ্ট হয়ে গেছে।'

নীল হজম করল, 'দেখুন, এত রাত্রে এসব আমার ভাল লাগছে না।'

'দূর! আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।' লাইনটা কেটে দিল মিলান। অত অল্প প্রশংসায় ক্ষেপে গিয়েছে মেয়েটা।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার টেলিফোন বাজল, 'শুনুন, আপনি কাল ভোরেই চলে যাবেন।'

নীল বলল, 'কোথায়?'

'তা আমি কি করে জানব? আপনাকে চলে যেতে বলছি।'

'সতি আমি বুঝতে পারিনি আপনি এত বোকা।'

'তার মানে?'

'আপনি কি করে ভাবলেন ছবিগুলোর অন্য কোন প্রিন্ট আমার কাছে নেই!'

হঠাৎ চুপ করে গেল মিলান।

নীল বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার। জরুরী। কাল সকালে, যতটা সকালে সম্ভব, চলে আসুন। আর হ্যাঁ, আসার সময় ভাল চিকেন প্যাটিস আনবেন। গুডনাইট।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখল সে। ভাগ্যিস মাথায় এসে গেল কথাগুলো। মানুষ সবচেয়ে দুর্বল নিজের সম্পর্কে, নিজের জন্যে মানুষের সবসময় বড় ভয়!

কফির কাপে চুমুক দিয়ে নীল মিলানের দিকে তাকাল। আজ মিলানের সাদা জিনস আর নীল টপ। সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। সে বলল, 'শার্ট প্যান্ট কেনা দরকার।'

'আপনার নেই?'

'ছিল। হোটেল থেকে পুলিস নিয়ে গিয়েছে স্যুটকেস।'

'ছবিগুলো কোথায় রেখেছেন?'

'আছে।' নীল হাসল।

'কত টাকা পেলে ওগুলো দেবেন?'

'এখনও ভাবিনি।'

'আপনাকে আমি পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারি।'

'পারেন। কিন্তু পুলিশ ধরলেই ছবিগুলো ওদের হাতে চলে যাবে।'

'উঃ! আপনি কি চান?'

'টাকা। আমার জন্যে নয়।'

'তা হলে?'

'একটি মেয়ের জন্যে। ওকে গুণ্ডারা অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল কয়েক বছর আগে। একটা মাংসপিণ্ড হয়ে অন্ধ মেয়েটি দরজা জানলা বন্ধ করে জন্তুর মত বেঁচে আছে। ওকে মানুষের চেহারায় আনতে যে খরচ হবে তার জন্যে টাকা দরকার।'

'আপনার কে হয়?'

'আমার? হতে পারত, হয়নি।'

'খুব সুন্দরী ছিল?' মিলানের গলার স্বরে মেয়েলি ব্যাপার।

'বুঝতে চেষ্টা করিনি।'

'কত টাকা দরকার?'

'এখনও জানি না।'

'ঠিক আছে, লালমকে যা দিয়েছিলাম তাই দেব আপনাকে।'

'এত সহজে দিতে চাইছেন?'

'আমি আর পারছি না। কাউকে বলাও যাচ্ছে না।'

'কেন? মাকে বলুন।'

'ভুল বুঝবে সবাই। কি যে করি!'

'আপনি যে ওই ছবি তুলেছেন তা কাকে বলেছেন?'

'কাউকে নয়।'

নীল হাসল, 'লালমকে আপনি খুব বিশ্বাস করতেন?'

'হ্যাঁ। ওকে আমি ভালবাসতাম।'

'আপনার মায়ের আপত্তি ছিল না?'

'ছিল।'

'আপনার মায়ের, মাপ করবেন, একজন বিশেষ বন্ধু আছে। কে তিনি?'

মিলানের চোয়াল শক্ত হল, 'আমার মায়ের ব্যাপারে এত খবর কে দিল?'

'জানতে পেরেছি।' নীল জবাব দিল, 'আপনি সহযোগিতা করলে দু'জনের উপকার হবে।

নিঃশ্বাস ফেলল মিলান, 'বনি পাণিগ্রাহী।'

'কি করেন তিনি ?'

'জানি না। বাবা বলেন বনি ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার। একসময় বাবাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মায়ের সঙ্গে। এটাই আমাদের পরিবারে অশান্তির কারণ!'

'বনি পাণিগ্রাহীর সঙ্গে লালমের পরিচয় ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। কার বেশি ব্যক্তিত্ব ? আপনার মায়ের না বনির ?'

'কেন ?'

'জিজ্ঞাসা করছি।'

'মায়ের। বাবার সঙ্গে তাই সংঘাত।'

'মিলান, আসুন আপনাকে পুরো ঘটনাটা বলি।' নীল শুরু করল। কিভাবে ট্রেন থেকে নেমে বৃষ্টির মধ্যে হাওড়া স্টেশন থেকে ক্রস কানেকশনে কথা শুনে একটার পর একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিল। চুপচাপ শুনে গেল মিলান। বলা শেষ করে নীল উঠে দাঁড়াল। পাশের ঘরের টেবিল থেকে প্যাডটা নিয়ে এসে মিলানের সামনে রাখল, 'এই হাতের লেখা কার, চেনেন ?'

মিলান দেখল। ধীরে ধীরে সে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

নীল বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে আপনার মা এইসব কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। তাঁর তো টাকার অভাব নেই।'

'বাবা মাকে প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার খরচ করতে দেন। মায়ের মতে সেটা খুবই কম। কোন কোন রেসের দিনে পুরো টাকাটাই হেরে যান মা। তখন ঝামেলা শুরু হয়। টাকার অভাব মায়ের কখনই যাবে না।' মিলান বলল।

'আমার ধারণা লালম বনি পাণিগ্রাহীকে ফোনে বলেছে তার কাছে আপনার কিছু ন্যুড ছবি আছে। টাকা পেলে সে দিতে পারে। বনি আপনার মাকে জানায়। আপনার মা ছবিগুলোকে পেতে চায়। কিন্তু এর মধ্যে অমিতাভ নামের লোকটা কি করে জুটল তাই বুঝতে পারছি না।'

'অমিতাভ ? কেমন দেখতে ?'

নীল বর্ণনা দিল। মাথা নাড়তে লাগল মিলান, 'বুঝেছি। অমিতাভ হল লালমের ফটোগ্রাফির দোকানের পার্টনার। ডিভোর্সী। কাস্টমারদের সঙ্গে লালমই কথা বলতে দিত ওকে।'

'সে কি ! আমি ভেবেছিলাম সে ম্যাডামের লোক।'

'না। ওর ডিভোর্সী স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। সে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে বেচারা।'

নীল মাথা নাড়ল। সেটা দেখে মিলান বলল, 'বুঝতে পেরেছি। অমিতাভর স্ত্রীর মৃত্যুর সময় আপনি ছিলেন। গল্পটা বলার সময় নাম বলেননি। এসব পুলিশ যদি জানতে পারে তা হলে আপনি কোন অবস্থাতেই বাঁচতে পারবেন না।'

নীল উঠল, 'কফি খাবেন ?'

'না।'

'এই বাড়িতে গত রাত্রে কয়েকজন এসেছিলেন ?

'মা ?'

'হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে কয়েকজন ছিল।'

'আসতেই পারেন। মায়ের কাছেও চাবি আছে। আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?'

'বাইরে।'

'মানে ?'

'একটু বেরিয়েছিলাম। না হলে ধরা পড়ে যেতাম। ওই দলের একজন আমাকে চেনে।'

'কিভাবে ?'

'লোকটা ড্রিমল্যান্ডে আমার পরে ঢুকেছিল।'

'কি রকম দেখতে ?'

নীল বর্ণনা দিল। মিলান একটু ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। যার কথা মনে পড়ছে সে আমার বোনের স্কুলের গেমস টীচার ছিল। সেই সূত্রে মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। কিন্তু তাকে তো আমাদের বাড়িতে বেশি আসতে দেখিনি।'

'কি নাম লোকটার ?'

'হারাধন।'

'কি ? যাচ্চলে ! এরকম নাম লোকটার থাকতে পারে ভাবিনি।'

'আপনি যার কথা বলছেন তিনি হারাধন নাও হতে পারেন।'

'হারাধন কোথায় থাকেন ?'

'জানি না। বোনের স্কুলে ফোন করলে জানা যাবে।'

'আপনার বোনের নাম প্রাণ! সুন্দর নাম। ওর স্কুলে ফোন করবেন?'

মিলান উঠল। টেলিফোনে কিছুক্ষণ কথা বলে ফিরে এল, 'হারাধন আর স্কুলের চাকরিতে নেই। ওরা ওর প্রেজেন্ট ঠিকানা জানে না।'

নীল মিলানের দিকে তাকাল। মিলান বলল, 'ছবিগুলো কখন পাব?'

'এ্যাঁ?' সম্বিত ফিরতে একটু সময় লাগল নীলের।

'আমি আপনাকে এক লক্ষ টাকা দিতে পারি। তাতে আপনার প্রেমিকার চেহারা ঠিক হোক বা না হোক সেটা আপনি বুঝবেন। কিন্তু আমার ছবিগুলো চাই। আজ বিকেলবেলায় আমি টাকা নিয়ে আসব।'

'কিন্তু আপনার মায়ের ব্যাপারটা?'

'মায়ের হাতে ছবি পৌঁছায়নি! ও নিয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই।'

'ঠিক আছে।' নীল মাথা নাড়ল।

'আপনি চালাকি করার চেষ্টা করবেন না।'

'বুঝলাম না।'

'মায়ের কাছে ওগুলো বেশি দামে বিক্রি করার ধান্দা নেবেন না।'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না, না?'

'না। পুরুষ জাতটাকেই আমি বিশ্বাস করি না।' মিলান বেরিয়ে গেল। নীল উঠে জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে মিলান। যোশীসাহেব মারা গেলে যে মেয়ে কয়েক কোটি টাকার মালিক হবে। অবস্থার চাপে তাকেও এখানে হেঁটে আসতে হচ্ছে।

দিনটা গড়িয়ে যাচ্ছে দিনের মত। কিছুই করার নেই। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত জেগে থাকতে হচ্ছে নীলকে। যে কোন মুহূর্তে ওই দরজা খুলে ম্যাডামের লোকজন এ বাড়িতে আসতে পারে। অবশ্য তারা আসবে গাড়িতে, তাতে আওয়াজ পাওয়া যাবে।

দুপুরবেলায় নীল যোশীবাড়িতে টেলিফোন করল। কেউ একজন রিসিভার তুলল। তাকে মিসেস যোশীর কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে জানাল মেমসাব এখন বিশ্রাম করছেন। নীল তাকে বলল, লালমসাহেবের ব্যাপারে কথা বলা দরকার, মেমসাহেবের জন্যেই। মিনিটখানেক পরে মিসেস যোশীর গলা পাওয়া গেল, 'কে কথা বলছেন?'

'আপনি লালমের তোলা আপনার মেয়ের ছবি এখনও পাননি, তাই না?'

'কে বলছেন আপনি?' চাপা স্বরে উত্তেজনা।

'যার অনেক টাকা দরকার।'

'কোত্থেকে বলছেন?'

'আপনি নিশ্চয়ই একটি শিশুর সঙ্গে কথা বলছেন না ম্যাডাম।'

'আপনি কে না জানলে আমি কোন কথা বলতে চাই না।'

'আপনি বুদ্ধিমতী। সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির রাত্রে অমিতাভ ড্রিমল্যান্ডে বসেছিল ওই ছবিগুলো নিয়ে। তাকে টেলিফোনে ধমকেছিলেন। মনে আছে?'

'আমি? কি যা তা বলছেন?'

'আমি ঠিক বলছি।'

'বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই।' রিসিভার রেখে দিলেন মহিলা।

টেলিফোনটার দিকে তাকাল নীল। ভদ্রমহিলা কি মিথ্যে কথা বলছেন? সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু নীলের মনে হচ্ছিল ভদ্রমহিলা সত্যিই বিস্মিত হয়েছেন। যে কণ্ঠস্বর সে শুনেছিল হাওড়া স্টেশনের টেলিফোন বুথে তার সঙ্গে এই কণ্ঠের কোন মিল নেই। এর মধ্যে ক'টা দিন চলে গিয়েছে বটে কিন্তু সেই

গলায় যে কর্তৃত্ব ছিল, বলার ধরনে যে পরিপাটি ভাব ছিল মিসেস যোশীর গলায় তা নেই। বরং রেসকোর্সে শোনা বেশি বয়সের শিশুসুলভ চাপল্য যদি হঠাৎ চাপা পড়ে পরিস্থিতির আড়ালে তা হলে যে গলা বেরুবে এখন সেটাই শুনতে পেল সে। ক্রমশ তার মনে হতে লাগল ইনি মিথ্যে বলেননি। অথচ গতকাল রাত্রে তিনি এখানে এসেছেন। এই টেবিলে বসে তার নাম লিখেছেন। তাকে নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনাও করেছেন। সেটাই প্রমাণ করে তার সম্পর্কে তিনি কৌতূহলী। তার ওপর হারাধন নামক সেই লোকটি যে ড্রিমল্যান্ডে ঢুকেছিল, রেসকোর্সে গিয়েছিল, লালমের ফ্ল্যাটে পৌঁছেছিল সে ওঁর সঙ্গী হয়ে এসেছিল। অতএব লালম, মিলান, সেই ছবিগুলো সম্পর্কে তিনি সবই জানেন। অবশ্যই হাতে পেতে আগ্রহী কিন্তু টেলিফোনে যে মহিলাকে অমিতাভ ম্যাডাম বলে সম্বোধন করেছিল সে আর ইনি একই মানুষ এমনটা ভাবা আর যাচ্ছে না। নীলের অস্বস্তি এখানেই।

ফ্রিজের খাবার নয়, দুপুরে পাঞ্জাবি হোটেলের খাবার খেতে ইচ্ছে করছিল। নীল বাড়ি থেকে বের হতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ভি আই পি রোডের একটা পাঞ্জাবি দোকানে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিল সে। আজ এক লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? মিলান যখন বুঝতে পারবে তার কোন ছবিই নীলের কাছে নেই তখন? কিন্তু টাকাটাকে পেতেই হবে। ইতিমধ্যে তিন-তিনটে খুন হয়ে গেছে। দুটো খুনের বোঝা তার ওপর চাপাবে পুলিশ। এক লক্ষ টাকার সুযোগটা সে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারে না।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে চলে এল সে। এ সব জায়গার পুরনো বই-এর দোকানে একসময় ন্যুড মেয়ের ছবি বিক্রি হত। এরকম কিছু ছবি চাই তার। মিলানকে যদি কয়েক সেকেন্ডের জন্যে বোকা বানানো যায় তাতেই যা করার করে নিতে পারবে। ক্যাথলিনের সামনে দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ ওর মনে হল একটা লোক সেই লিন্ডসে স্ট্রীট থেকে তার পেছন পেছন আসছে। হয়তো ভুল। কিন্তু লিন্ডসে স্ট্রীটে ট্যাক্সি থেকে নেমে লোকটাকে দেখেছিল যেন। কেন কেউ তাকে অনুসরণ করবে? হঠাৎই মনে হল এটা তো সেই হিটলার অফিসারের এলাকা। এই লোকটা পুলিশ নয় তো! সে হঠাৎই পেছন ফিরল। কিন্তু লোকটা এখন কোথাও নেই। নীল হাঁফ ছাড়ল। মনে ভয় থাকলে সবসময় অকারণে ছোবল খেতে হয়।

মাত্র একশ টাকায় পাঁচখানা ছবি পেয়ে গেল সে। ছাপা ছবি নয় একেবারে

গ্লসি পেপারে ডার্করুমে প্রিন্ট হওয়া কপি। মেয়েটি কে সে জানে না। কিন্তু শরীর দেখিয়েছে অকপটে। মিলানের সঙ্গে এর কোন তুলনাই চলে না। তবু— !

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে পা বাড়াতেই সেই লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল, 'কি কিনেছেন ?'

'কেন ? আপনার কি দরকার ?' নীল উত্তেজনা চাপল।

'জানেন না অশ্লীল ছবি কেনা অপরাধ ? আপনাকে থানায় যেতে হবে।'

'দূর ! যে বিক্রি করছে তাকে গিয়ে ধরুন।'

'একদম বাজে কথা বলবেন না। দাঁড়ান। যাবেন না। আমি পুলিশ।' লোকটা চেঁচাল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেল। অনেকেই মজা দেখছে। কেউ কেউ ছেড়ে দিতে বলছে। লোকটা মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, ছেড়ে দিতে পারি যদি দেখি এর হাতে কোন উল্কি নেই !'

নীল বুঝল সে হিটলারের অনুচরের হাতে পড়েছে। অগত্যা তাকে চিৎকার করলে হল, 'আরে, এ দেখছি পুরো পাগল। ন্যাংটো মেয়ের ছবির সঙ্গে উল্কির কি সম্পর্ক ? এ্যাঁ !' বলতে বলতে সেখান থেকে একটা ছবি বের করে ভিড়ের দিকে এগিয়ে ধরল, দেখুন, দেখুন আপনারা।' সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ পড়ে গেল। বেশ কিছু লোভী কামুক চোখ ছবির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটা বাধা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে ঠেলে ফেলে লোকগুলো। নীল দেখল একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট দিয়ে। প্রাণপণে দৌড়ে ট্যাক্সিটাকে থামাল সে। দরজা খুলে উঠে পড়েই দেখল সেই লোকটা পেছনে ছুটে আসছে। নীল ট্যাক্সি-ওয়ালাকে বলল, 'জলদি চালিয়ে। গুণ্ডা হ্যায়।'

লোকটার বোধহয় হিন্দী সিনেমা দেখার অভ্যেস আছে। চটপট গাড়ির গতি বাড়াল। অনেকটা দূরে চলে আসার পর জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ভুল হয়ে গেল !'

'নীল অবাক, 'মানে ?'

'লোকটা সত্যি গুণ্ডা কিনা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল ?'

'জিজ্ঞাসা করলে আর দেখতে হত না। সল্ট লেক চলুন।'

সে চোখ বন্ধ করল। কপালজোরে আজ বেঁচে গেছে। হিটলারের লোক এই তল্লাটে তার চেহারার বিবরণ নিয়ে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা সে জানবে কি করে ? পাবলিক যদি তাকে উল্কি দেখাতে বাধ্য করত তাহলে— ! না,

ব্যাপারটা ভাবতে পারে না সে। অনেক হয়েছে। টাকাটা যেমন করেই হোক অবিনাশদের বাড়িতে পেঁাছে দিতে হবে। সেটা দিতে আর একবার তাকে ঢুকতে হবে হিটলারের এলাকায়। সে যে ওই বাড়িতে গিয়েছিল এ খবর হয়তো হিটলার পেয়ে গেছে এর মধ্যে। অবিনাশের মাকে ডাক্তারের চেম্বারে যে ভদ্র-লোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনিই হয়তো বলে দিয়েছেন পুলিশকে। ওখানে যাওয়া মানে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া। তবু নিতে হবে। শেষবার। তারপর বেরিয়ে যাবে কলকাতা থেকে। চিরকালের মত। নীল পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছল।

দরজা খোলার আগে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। বাড়িটা এখনও নিষ্প্রাণ। সে ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকল। ঘড়িতে এখন চারটে বাজে। সে চারপাশে তাকাল। দ্বিতীয় ঘর পেরিয়ে তৃতীয় ঘরের দরজায় দাঁড়ানো মাত্র তার হৃৎপিণ্ড এক লাফে গলার কাছে চলে এল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। যে বিছানায় গতরাত্রে সে শুয়েছিল সেখানে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মিলান। তার একটা পা অন্যটির ওপর তুলে রাখা। শর্টস আর গেঞ্জি পরে আছে মেয়েটা। ডান হাত ভাঁজ করে কনুই দিয়ে চোখ ঢেকেছে ঘুমাবার সময়। ওপাশে একটা চেয়ারের ওপর ওর প্যান্ট ঝুলছে। চেয়ারের কোণে ওর ব্যাগ ঝোলানো। নীল মিলানের দিকে তাকাল। শাঁখের মত চমৎকার পা দুটো থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে আসছে। এত দূর থেকেও ওর পেলবতা প্রত্যক্ষ করতে একটুও অসুবিধে হচ্ছিল না।

নীল ঘরে ঢুকল। সে বুঝতে পারছিল প্রচণ্ড সম্মোহিত হয়ে পড়েছে সে। তার নিঃশ্বাস শব্দ করেছিল। এমন মেয়ের জন্যে দুবার পৃথিবীতে ঘুরে আসা যায়। এমন মেয়ে সঙ্গে থাকলে সে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচেও শুয়ে থাকতে পারে। তখনই নিজের হাতে ধরা খামটার কথা খেয়াল করল সে। ঝটপট ওটাকে ব্রিফকেসের নিচে চালান করে দিতেই শুনল, 'হাই।'

নীল মুখ ফেরাল। শায়িত অবস্থাতেই দুটো হাত দু'পাশে ছুঁড়ে আলস্য দূর করছে মিলান, 'কোথায় যে হুটহাট চলে যান ? ওয়েট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'ধন্যবাদ। না হলে এমন সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পেতাম না।'

'ওঃ। স্টপ ইট। আপনাকে বলেছি যে আমি ছেলেদের ঘেন্না করি।'

'বলেছেন! কিন্তু ছেলেরা না থাকলে অমন সৌন্দর্য দেখবে কে ?'

'বয়ে গেছে! ছেলেরা কি তা আমার জানা হয়ে গেছে!' মুখ বেঁকালো মিলান।

নীল হাসল, 'তাহলে ওই ছবিগুলো তুলিয়েছিলেন কেন? একটা ছেলেই তো তুলেছিল!'

'নিজেকে দেখার জন্যে। এই আর কি, কিরকম দেখতে সাধ হয়েছিল। আর তখন পর্যন্ত লালম আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। যাকে সব দিয়েছি তাকে ছবি তুলতে দিতে আপত্তি করব কেন?' মিলান উঠে বসল!

তার দিকে তাকিয়ে নীল বলে উঠল, 'স্পেনডিড!'

'বাট ইটস নট ডিভাইন।' মিলান খাট থেকে নেমে প্যান্টের দিকে হাত বাড়াল।

'ওটা এখনই দরকার?' নীলের আপত্তি শোনা গেল।

'এই বেশে আমাকে দেখতে আপনার ভাল লাগছে?'

'অবশ্যই।'

'যার জন্যে টাকার দরকার, এ্যাসিডে পোড়ার আগে সে কি এরকম ছিল?'

'আমি জানি না।'

'সেকি? তাকে দ্যাখেননি?'

'সবসময় নিজেকে ঢেকে রাখতেই স্বস্তি পেত সে।'

শুনে ঠোঁট ওল্টালো মিলান। তারপর হাত বাড়াল, 'দিন।'

সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে ফিরে এল। এতক্ষণ কথা বলার সময়ে নীল স্পষ্ট বুঝতে পারছিল তার মুখে রক্ত জমছে। গরম হয়ে গেছে নিঃশ্বাস। হঠাৎই ঠাণ্ডা জল পড়ল যেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি টাকা নিয়ে এসেছেন?'

'নিজেকে কিনতে আমি তৈরী।'

'টাকাগুলো আমি দেখতে চাই।'

'উফ! টাকা টাকা টাকা!' হিস হিস করে উঠল মিলান, 'আপনারা পুরুষরা টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনেন না।' দ্রুত ব্যাগটাকে টেনে নিয়ে সে নোটের বান্ডিল হাতে তুলে নিল। একমুহূর্ত দেখে টেবিলে রেখে দিল সে।

নীল বলল, 'ধন্যবাদ। মিলান, আমি আপনার শত্রু নই। এভাবে টাকা নিতে খারাপ লাগছে। কিন্তু এর একটা পয়সাও আমার জন্যে নয়। আপনাকে আমি একটা অনুরোধ করতে চাই।'

'অনুরোধ?'

'হ্যাঁ। এবার আমি কলকাতায় এসেছিলাম কারণ দশবছর আগে যোগ্যতার অভাবে আমাকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। যে মেয়েটিকে আমি পছন্দ করতাম

তার যোগ্য বলে কেউ আমাকে মনে করেনি। দশবছর শুধু নিজেকে খরচ করে গেছি। টাকা পয়সা জমানোর চেষ্টা করিনি। হয়তো দশবছর পরে শুধু অভিজ্ঞতা ছাড়া আমার কোন সঞ্চয় নেই। তবু শহরে এসেছিলাম তাকে দেখতে। সে যদি বিয়ে-থা করে সংসারী হত তাহলে একটুও দুঃখিত হতাম না। তার বদলে ওকে এই অবস্থায় দেখলাম। আমি এখানে কোন আশা নিয়ে আসিনি। ওর যা অবস্থা তাতে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন। আমি চাইছি ওর বেঁচে থাকাটা একটু সহজ করে ফিরে যেতে। এখানে এসে নিজের অজান্তে এবং কিছুটা লোভের কারণেই একটার পর একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়লাম। পুলিশ আমাকে খুঁজছে। তারা আমাকে পেলে সমস্ত অপরাধের দায় এমন কি লালম এবং লিফটম্যানের খুনের বোঝা আমার ওপরে চাপিয়ে দিয়ে চিরকালের জন্যে আটকে রাখবে। হয়তো ফাঁসিতে ঝোলাবে। এসব করার কোন দরকার ছিল না আমার। কিন্তু হয়ে গেল।' নীল নিঃশ্বাস ফেলল।

'আপনি ওই মহিলাকে ভালবাসেন?' অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞাসা করল মিলান।

'একসময় নিশ্চয়ই বাসতাম। আঘাত এবং সময় বড্ড ধুলো ফেলে সম্পর্কের ওপর। জঙ্ ধরিয়ে দেয়। এখন আর সেই অর্থে ভালবাসি না। কিন্তু কষ্ট তো হয়ই।'

হেসে উঠল মিলান, 'আমি খুশী হতাম। আপনি বলতে পারতেন, বাসি না। ছেলেরা বেকায়দায় পড়লে তাই বলে। ধন্যবাদ। আপনি কোথায় ফিরে যাবেন?'

'হয় বোম্বে নয় মাদ্রাজ। জাহাজ ছাড়া আর কিছু জানি না যে।'

'যাবেন কি করে। স্টেশন এয়ারপোর্টে পুলিশ আপনাকে খুঁজতে পারে।'

'ঠিকই। কিন্তু যেতে হবে।'

'আপনাকে একটা কথা বলা দরকার।'

'বলুন।'

'আজ আমি লালমের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম।'

'সেকি?'

'না গিয়ে আমার কোন উপায় ছিল না। ওকে আমি কিছু চিঠি লিখেছিলাম এককালে। সেগুলো ও একটা কাঠের বাক্সে রেখে দিয়েছিল। চিঠিগুলো ফেরৎ পাওয়া দরকার ছিল আমার। কিন্ত পেলাম না।'

'নেই ?'

'না। বাক্সটা টেবিলের ওপর খোলা পড়েছিল।'

'তাহলে পুলিশ নিয়ে গেছে।'

'না। আমি ঘরে ঢুকে একটা চুরুটের গন্ধ বাতাসে পেয়েছিলাম।'

'চুরুটের গন্ধ ?'

'হ্যাঁ। গন্ধটা টাটকা।'

'হারাধন !' নীল বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল মিলান, 'ইয়েস ! কিছুতেই ট্রেস করতে পারছিলাম না। বারংবার মনে হচ্ছিল গন্ধটা চেনা। আমি ঢোকার একটু আগে ও ওই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। দরজাটা ভেজানো ছিল। কিন্তু পুলিশ তো তালা মেরে দিয়ে যাবে, এমনই হয়। আমি ঝুঁকি নিয়েছিলাম ওখানে গিয়ে।'

'লালমের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আপনি এখানে চলে এসেছেন ?'

'না। ব্যাঙ্ক হয়ে এসেছি।'

'সর্বনাশ।'

'মানে ?'

'আপনি জানেন না হারাধন আপনাকে ফলো করেছে কিনা !'

'না জানিনা। আমি ট্যাক্সিতে এসেছি। খেয়ালও করিনি।'

'এখানে আমার সঙ্গে থাকাটা আপনার পক্ষে বিপজ্জনক হবে মিলান। আপনি এখনই চলে যান।' ব্যস্ত হয়ে উঠল নীল।

'আপনি ?'

'আই উইল টেক কেয়ার অফ মাই সেল্ফ। শুধু একটা অনুরোধ। আমার পক্ষে আর ইলিয়ট রোডে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, দয়া করে যদি টাকাটা ওই ঠিকানায় পৌঁছে দেন।'

'মহিলা ওখানে থাকেন ?'

নীল একটা কাগজে চটপট ঠিকানাটা লিখে মিলানের হাতে দিল, 'টাকাটা তুলে নিন ! সরাসরি ওর হাতে দেবেন। একটা অন্ধকার ঘরে বসে থাকে ও।'

'নাম কি ?'

'অঞ্জনা।'

ঠিকানা এবং টাকা ব্যাগে ঢোকাল মিলান, 'আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে ?'

'জানি না।'

'আমার ছবিগুলো ?'

মিলানের কথা শেষ হতেই খুট করে একটা শব্দ বাজল। নীল সজাগ হল। তারপর ইশারায় চুপ করতে বলল মিলানকে। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে ইঙ্গিত করল ছাদের সিঁড়ির দিকে চলে যেতে। খুট শব্দটা কানে এল। কেউ এসেছিল, দরজাটা বন্ধ হল।

মিলান ওপরে উঠে যাওয়ামাত্র নীল দরজার পাশে দাঁড়াল। করিডোর দিয়ে যে আসবে তাকেই এই দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে। কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই একটা শরীরকে উঁকি মারতে দেখল নীল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত চালাল। জাহাজীদের হাতে যে পরিমাণ শক্তি থাকে তার সবটাই খরচ করল লোকটার ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল হারাধন। পড়ে স্থির হল।

তাহলে হারাধনের কাছেও চাবি থাকে এই ফ্ল্যাটে ঢোকার। নীল হাঁটু মুড়ে হারাধনের পাশে বসে ওর পকেটে হাত দিল। আর তখনই করিডোর থেকে গলা ভেসে এল, 'হাত তুলুন !'

নীল পাথর হয়ে গেল। বসা অবস্থাতেই মুখ ঘুরিয়ে সে প্রথমে রিভলভার পরে তার পেছনে দাঁড়ানো মানুষটিকে দেখল। সে কি দেখছে ? একি সম্ভব।

'হাত তুলুন ! নইলে গুলি করব।' টেলিফোনের গলাটা বেরিয়ে এল।

'তুমি ? তুমি !'

'ন্যাকামি করবেন না।' প্রাণকে মোটেই কিশোরী বলে মনে হচ্ছে না এখন।

'তুমিই তাহলে ম্যাডাম ? ভগবান !'

'দিদির ছবিগুলো কোথায় ?

'সে নিয়ে গিয়েছে।'

'বিশ্বাস করি না। সেগুলো কেনার জন্যে দিদি আজও ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছে। ছবিগুলো আমার চাই। এখনই। কোনরকম চালাকির চেষ্টা না করে উঠে দাঁড়ান। উঠুন।' প্রাণ ধমকে উঠল।

নীলের বিস্ময় কাটছিল না। রেসকোর্সে দেখা সেই কিশোরীর কচি গলা এখন উধাও হয়ে গিয়েছে। ওই বয়সের কোন মেয়ে এমন কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলতে পারে !

'হ্যারি সেন্স ফিরে পাওয়ার আগে যদি ছবিগুলো আমাকে দিয়ে দেন তাহলে আপনি বেঁচে যাবেন। নইলে ও আপনাকে ছিঁড়ে খাবে।'

'ছবিগুলো যার তাকেই দিয়েছি।'

'দেননি। ওগুলো আমাকে দিন।'

'কেন ?'

'কেন ? দিদি সুন্দরী, ভাল মেয়ে। আমি সাধারণ। সব অ্যাটেনশন দিদি পেয়েছে। আমি সো সো। ছবিগুলো এক একটা বাবার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলে ওঁর চৈতন্য ফিরবে। যোশী প্রোপার্টিসের একমাত্র মালিক হব আমি। চলুন। এগোন।' রিভলভার নাচাল প্রাণ।

অগত্যা উঠল নীল। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মিলান যে এসব কথা শুনতে পাচ্ছে এ ব্যাপারে সে নিঃসন্দেহ। কিন্তু নিজের বোনকে দেখেও মিলান নেমে আসছে না কেন। নীলকে বাধ্য হয়ে সেই ঘরে ঢুকতে হল। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল প্রাণ রিভলভার হাতে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। কি করা যায় ? সে আবার বলল, 'বিশ্বাস কর তোমার দিদি সব ছবি নিয়ে গেছে।'

'বিশ্বাস করি না। শুনুন, আর মিনিট দশেক সময় পাবেন। অমিতাভ পুলিশকে বলেছে আপনার আঘাতেই ওর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। লালমের লিফট-ম্যানকে যে আপনি খুন করেছেন তা বাড়ির দারোয়ানের সাক্ষীতে স্পষ্ট। অতএব পুলিশ এখানে আসছে। আপনাকে আমি তবু সুযোগ দিতে চাই পালাবার। ছবিগুলো আমাকে দিয়ে আপনি চলে যেতে পারেন।' প্রাণ হাসল।

নীল বলল, 'আর লালমকে খুন করেছে কে ?'

'দিদি।'

'কে বলল আপনাকে ?'

'বাইক দাঁড় করিয়ে লালম ওপরে ওঠার পরেই দিদি মাথায় ঘোমটা দিয়ে নিচে নেমে এসেছিল। হ্যারি ওকে ফলো করে কিছুটা গিয়ে দ্যাখে পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে সে হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অবশ্য ওই খুনের দায়টাও পুলিশ আপনার কাঁধে চাপাবে। দিন।'

ব্রিফ কেসের নীচ থেকে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে কেনা খামটাকে টেনে বের করল নীল। আর তখনই মিলানের চিৎকার কানে এল, 'না নীল, দিও না। ছবি-গুলো দিও না।

তীরের মত ছুটে এসেছিল মিলান। কিন্তু তার আগেই সে আটকে গেল। হারাধনের যে চেতনা ফিরে এসেছিল এর মধ্যে। তড়াক করে উঠে সে জড়িয়ে

ধরল মিলানকে। ধরে আদুরে হাসি হেসে উঠল। মিলান চিৎকার করল, 'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে। প্রাণ, তোর এত বড় স্পর্ধা একটা গেমস টিচারকে দিয়ে আমাকে অপমান করাচ্ছিস?'

হারাধন বলল, 'গেমস টিচার ছিলাম, সারা জীবনের হব।'

মিলান বলল, 'নীল দিও না ওগুলো। আমাকে ও সহ্য করতে পারে না। ওগুলো হাতে পেলে সারাজীবন আমাকে ব্ল্যাকমেইল করবে ও।'

'ছবিগুলো দিন। এই শেষবার বলছি।'

খামটা নিয়ে সামনে এগিয়ে এসে নীল বলল, 'মিলানকে ছেড়ে দিন।'

প্রাণ একটা হাত নেড়ে ইশারা করল হারাধনকে।

হারাধন বলল, 'ছেড়ে দিলে ঝামেলা করবে।'

নীল বলল, 'আমি বলছি করবে না।'

হারাধন বেশ অনিচ্ছায় মিলানকে ছেড়ে দিল।

নীল খাম থেকে ছবিগুলো বের করল। রিভলভার উঁচিয়ে থাকা প্রাণ বলল, 'ওগুলো খামেই থাকুক। দিন তাড়াতাড়ি।'

নীল আচমকা ছবিগুলো ছিঁড়তে লাগল। চিৎকার করে উঠল প্রাণ। আর তীরের মত ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ল হারাধন নীলের ওপর। তার প্রচণ্ড ধাক্কায় টাল সামলাতে পারল না নীল। ছবির টুকরোগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। সেইসময় আনন্দিত মিলান চিৎকার করে উঠল, 'থ্যাঙ্ক ইউ নীল। ছিঁড়ে ফেল, আরও ছিঁড়ে ফেল।'

মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরেও নীল হাতের কাছে থাকা ছবির একটা বড় টুকরো ছিঁড়তে পারল। এখন ঘরের মেঝেতে নারী শরীরের বিভিন্ন নগ্ন অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বীভৎস হয়ে আছে। হঠাৎ পেটে প্রচণ্ড আঘাত পেল নীল। ক্ষিপ্ত হারাধন তার পেটে লাথি মেরে দ্বিতীয়বার মারতে উদ্যত হয়েছে। কোন-রকমে নিজেকে সরাতে লাথিটা নীলের নিতম্বে এসে লাগল। সে প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হারাধন আবার এগিয়ে এল। নীল চোখের সামনে ব্রিফকেসটা দেখতে পেল। সমস্ত শক্তি জড়ো করে ব্রিফকেসটা ছুঁড়ে মারল হারাধনের দিকে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটাকে লুফে নিল হারাধন। তারপর খ্যাসখেসে গলায় বলল, 'আজ তোকে কিমা বানাবো। এ্যাদ্দিনের সব আশা নষ্ট করে দিল।'

নীল দেখল হারাধন ব্রিফকেসটাকে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে। সে

মিলানের গলা শুনতে পেল, 'অনেক হয়েছে। ওকে থামতে বল প্রাণ!'

প্রাণের হাসি বাজল, 'না।'

সঙ্গে সঙ্গে মিলান চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাণের ওপর আর তৎক্ষণাৎ গুলিটা বেরিয়ে এল। কান ফাটানো আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হারাধনকে আচমকা নড়ে উঠতে দেখল নীল। তারপর ধীরে ধীরে ছবির টুকরোর ওপর লুটিয়ে পড়ল। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে ওর পেট থেকে।

প্রাণ চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল হারাধনের ওপর। পাগলের মত করছিল মেয়েটা। নীল আর দাঁড়াল না। এক লাফে বাইরে এসে মিলানকে বলল, 'চটপট।' সে দ্রুত করিডোর দিয়ে বাইরের দরজায় চলে এল। না কেউ নেই। পেছনের মিলানের গলা পেল সে, 'কি হবে?'

'তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাও।' নীল রাস্তায় নেমে পড়ল।

'কিন্তু প্রাণ আমার বোন।'

'কিন্তু ও তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল। খুন করতে পারত।' নীল ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। একটু ইতস্তত করে মিলান ছুটে এল, 'লোকটা কি মরে গিয়েছে?'

'জানি না। ওসব জানার সময় আমার নেই। শুধু জানি এর দায়ও আমার ওপর পড়বে। আমাকে এখনই কলকাতার বাইরে চলে যেতে হবে।' নীল উদ্‌ভ্রান্তের মত কথাগুলো বলেই স্থির হল। দূরে কতগুলো গাড়ি আসছে। সে চটপট মিলানকে টেনে নিয়ে গেল পাশের গাছের আড়ালে। প্রথমে একটা ট্যাক্সি পরে তিনটে পুলিশের জিপ দেখতে পেল সে। জিপগুলো বেশ কিছুটা এগিয়ে থেমে গেল। ট্যাক্সিটা পৌঁছে গেল যোশীদের বাড়ির সামনে। ট্যাক্সি থেকে সেই লোকটাকে প্রথমে নামতে দেখল যে তাকে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, ইউনিফর্ম পরা দ্বিতীয় লোকটা কোমরে হাত রেখে বাড়িটাকে দেখছে। এই কি সেই অফিসার যার নাম হিটলার? হিটলার অথবা অফিসার ইশারা করতে জিপগুলো এগিয়ে গেল।

নীল বলল, 'বাঁ দিকের রাস্তায় চল। কুইক।'

মিলান বলল, 'ওদের কি হবে?'

'ভাল হবে। হাসপাতালে নিয়ে যাবে।'

ওরা প্রায় ছুটছিল। নির্জন সল্টলেকের রাস্তায় দেখার মত কেউ ছিল না। দ্বিতীয় আইল্যান্ডে পৌঁছে নীল বলল, 'আপনি চলে যান।'

'একটু আগে তুমি বলেছ তুমি।' মিলান হাঁপাচ্ছিল

'ঠিক আছে।'

'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'দ্যাটস অলরাইট। এবার এসো।'

'পুলিশ ওই ঘরে ছবির টুকরো থেকেও আমার মুখ খুঁজে পাবে। প্রাণ তাদের আমার নামে বলতে দ্বিধা করবে না।' মিলান চুল ঝাঁকাল।

নীল চোখ বন্ধ করল। সে কি করে বলবে ছবিগুলো ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে কেনা? ওই ছবির মুখের সঙ্গে মিলানের কোন মিল নেই। একথা বললে মিলান কোনদিনই এক লক্ষ টাকা অবিনাশের বোনের কাছে পেঁাছে দেবে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করতে চাও?'

'আমার আর ফেরার পথ নেই।'

'ছবিগুলোর জন্য?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু টাকাটা তো ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পেঁাছে দেবার দায়িত্ব তোমার।'

'যদি সেখানে গেলে আমাকে ধরে ফেলে?'

'এত তাড়াতাড়ি তোমার খবর ওরা পাবে না।' নীল হাত বাড়িয়ে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করালো, 'উঠে এস।'

মিলান কথাটা শুনল। নীল ট্যাক্সিওয়ালাকে ইলিয়ট রোডে যেতে বলল। মিলান ফিসফিস করল, 'তুমি যাবে ওখানে?'

'হুঁ। ট্যাক্সিতে বসে থাকব। তুমি গিয়ে দিয়ে আসবে।'

'যদি কেউ চিনতে পারে তোমাকে?'

'ট্যাক্সিতে বসে থাকলে সম্ভাবনা কম।'

মিলান বলল, 'আসলে তুমি দেখতে চাও আমি ঠিকঠাক পেঁাছাচ্ছি কিনা।'

নীল জবাব দিল না।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না, না?' মিলান জানতে চাইল।

'এখন আমার নিজের ওপর বিশ্বাস কমে গেছে মিলান। কেউ কখনও ভাবতে পারে প্রাণের মত একটা ষোলো-সতের বছরের মেয়ে এই ভূমিকা নিতে পারে!'

'ছেলেবেলা থেকেই ও আমাকে ঈর্ষা করত। কিন্তু—' মিলান ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলালো। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এর পরে কি করবে?'

'জানি না। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'মাথা খারাপ নাকি ?'

'মানে ?'

'তুমি কোথায় যাবে ?'

'আমার আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।'

'আশ্চর্য ! তুমি আমাকে চেনো না, জানো না !'

'হতে পারে। চিনতাম না, জানতাম না। নাউ আই লাইক ইউ।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ কি পরিবেশে মানুষ হয়েছ। এখন আমার পকেটে হাজার টাকাও নেই।' নীল অদ্ভুতভাবে হাসল।

'ডোন্ট ইউ লাইক মি ?'

'ও সিওর। আমার দেখা মেয়েদের মধ্যে তুমি সব থেকে সুন্দর।'

'তাহলে ? টাকার জন্যে আমি ভাবি না। আমার কোমরে একটা সোনার চেইন আছে। চেইনটার গায়ে দশটা হিরো বসানো। বাড়িতে যদি কখনও ইনকাম-ট্যাক্স রেইড করে তাই সবসময় ওটাকে পরে থাকতে হয় আমাকে। বিক্রী করলে অনেকদিন আর টাকার ভাবনা ভাবতে হবে না।' মিলান সরল গলায় বলল।

'কোথায় বিক্রী করবে ? কে কিনবে ?'

'যে দোকান থেকে বাবা ওটা কিনেছিল তারাই ওটা নিতে আগ্রহী। এসব ট্রানজাকশন ক্যাশে হয় সবসময়।'

গ্যালিব হোটেল ছাড়িয়ে ট্যাক্সিটা দাঁড় করালো নীল। পই পই করে সে মিলানকে বুঝিয়ে দিয়েছিল বাড়িটা। একটা রিক্সা নিয়ে যাওয়ার পথে মিলান অনেককে কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকাতে দেখল। পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ মেয়েদের পায়ে নিজেদের সমর্পণ করতে পারলে কি খুশীই না হয় ! নীলকে তার ভাল লেগেছে। লালমের চেয়ে অনেক বেপরোয়া, স্পষ্ট-ভাষী। এই হার বিক্রী করে অন্তত লাখ দশেক পাওয়া যাবে। ওই টাকায় সে নীলের সঙ্গে দশবছর থাকতে পারবে নিশ্চিন্তে। তদ্দিনে নীল কি অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না ? অবশ্যই পারবে। আর জাহাজে চাকরি করতে হবে না নীলকে। কোন এক নির্জন পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট সুন্দর বাংলো নেবে তারা। প্রচুর ফুল ফুটবে তার সামনে। দিনরাত ভালবাসাবাসি করে দিব্যি কেটে যাবে।

কান ফাটানো একটা সিটির আওয়াজ এবং সেইসঙ্গে অশ্লীল হাসির শব্দে বাস্তবে ফিরে এল মিলান। চাপা গলায় রিক্সাওয়ালাকে সে বলল, 'জলদি।'

ট্যাক্সিতে বসে মুখ মুছছিল নীল, বারংবার। আসলে রুমালটা সে ব্যবহার করছিল মুখ ঢাকার জন্যে। এলাকায় পুলিশ ছাড়া চেনাজানা মানুষের তো অভাব নেই। একটাই সুবিধে, হিটলার এখন সল্টলেকে। কিন্তু তার বাহিনী তো সক্রিয়।

কলকাতা থেকে পালাবার উপায় ভাবছিল সে। বিহারের দিকে ঢুকে পড়লে ট্রেন ধরতে অসুবিধে নেই। ধর্মতলা থেকে এককালে দূরপাল্লার বাস ছাড়ত। কিন্তু সেখানেও নিশ্চয়ই পুলিশ নজর রেখেছে। আচ্ছা, এই ট্যাক্সি নিয়ে যদি বর্ধমানে চলে যাওয়া যায়। সেখান থেকে ট্রেন ধরবে। নাঃ, এই বুড়ো ট্যাক্সি-ওয়ালাও তাকে সন্দেহ করবে। হঠাৎ তার মনে হল হাওড়ার পরের স্টেশন থেকে খড়্গপুর লোকাল ধরলে কেমন হয়? ওই স্টেশন পর্যন্ত তো ট্যাক্সি নিয়ে স্বচ্ছন্দে যাওয়া যেতে পারে।

সে মাথা নাড়ল। রুমালে চিবুক মুছতে মুছতে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ করে। মিলান নিশ্চয়ই এক লক্ষ টাকা পেঁছে দিয়েছে ওখানে। জীবনে এই একটা কাজ করতে পেরে স্বস্তি হচ্ছে খুব। অঞ্জনাকে সে কি এখনও ভালবাসে। ভালবাসা মানে কি? যা ছিল একসময় বুকের তাগিদ তা এখনও অদ্ভুত ধরনের স্নেহে পেঁছে গেছে। একেই লোক করুণা বলে? না, সে কখনও কাউকে করুণা করেনি, অঞ্জনাকে তো নয়ই। মিলান তাকে পছন্দ করে বলেছে। ও 'লাইক' শব্দটা ব্যবহার করেছে। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। মিলানকে এখন আর অপছন্দ হচ্ছে না তার। কিন্তু ও যেদিন জানতে পারবে ফ্রি স্কুল থেকে কেনা ছবিগুলো সে ছিঁড়েছিল সেদিনই সব পছন্দ শেষ হয়ে যাবে। হয়তো ওই হীরের হার বিক্রী করে অনেক টাকা পাওয়া যাবে, অনেক নিশ্চিত ভবিষ্যৎ কিন্তু সেটা মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। তাছাড়া পুলিশ এখন অবিরত তাকে খুঁজে বেড়াবে। যা সত্যি তা বলে দেওয়া ভাল।

নীল দেখল সেই একই রিক্সা নিয়ে মিলান ফিরে এল। ভাড়া মিটিয়ে এগিয়ে আসতেই ট্যাক্সির দরজা খুলে দিল নীল। মিলান উঠে বসতে ট্যাক্সি চালু হল। নীল বলল, 'থিয়েটার রোড।'

'ওখানে কেন?' মিলান চমকে উঠল।

'দরকার আছে।' নীল গম্ভীর গলায় বলল।

'নীল!' মিলানের স্বরে কাঁপুনি।

'বল।'

'খুব খারাপ ব্যাপার হয়ে গেল!' করুণ গলায় বলল মিলান।

'কি হল?' অবাক হয়ে তাকাল নীল।

'অঞ্জনার কাছে ওর মা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার ঘরে বসেছিল সে। আমি ওকে বললাম, বিশেষ অসুবিধের জন্যে তুমি আসতে পারনি তাই আমার হাত দিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছ ওর চিকিৎসার জন্য।'

'ঠিকই। তারপর?'

'অঞ্জনা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কে? বললাম তোমার পরিচিত। আমাকে বলল টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যান। আমি একজন খুনীর টাকায় স্বাভাবিক হতে চাই না। আমি বোঝাতে চাইলাম সে রাজী হল না কিছুতেই। ওর মা বলল আজ নাকি পুলিশ এসেছিল ডাক্তারের কাছ থেকে খবর পেয়ে।' খুব দুঃখের সঙ্গে ঘটনাটা বলল মিলান।

হঠাৎই হো হো করে হেসে উঠল নীল।

মিলান জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছ যে?'

'আফ্রিকার এক জাতের মানুষ মনে করে পাপের টাকায় মরণের গন্ধ থাকে।' হাসতে হাসতে নীল বলল, 'অঞ্জনা বুদ্ধিমতী, তাই, বুঝে নিয়েছে।'

'এটা একদম বোকামি। বোধহয় ওরা ভয় পেয়েছে টাকা নিলে পুলিশের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। একি? কোথায় এলে?'

ট্যাক্সিওয়ালাকে দাঁড়াতে বলল নীল, 'এখান থেকে তোমার বাড়ি এক মিনিটের হাঁটা পথ। তুমি ফিরে যাও।'

'তার মানে?' আঁতকে উঠল মিলান।

'হারাধন বা প্রাণ তোমাকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে যে স্টেটমেন্টই দিক না কেন তুমি তা অস্বীকার করবে।'

'অস্বীকার করলে শুনবে?'

'হ্যাঁ। কারণ ওদের হাতে কোন প্রমাণ নেই।'

'আমার ছবির টুকরোগুলো?'

'ওগুলো তোমার ছবি নয় মিলান, তুমি যে প্যাকেটটা নিয়ে গেছ তার বাড়তি একটা ছবিও আমার কাছে ছিল না। তোমার ওপর চাপ রাখতে আমি বাধ্য হয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে অন্য মেয়ের নগ্ন ছবি কিনে এনেছিলাম। তুমি

দেখতে চাইলে বিপদে পড়তাম তাই ওরা এসে পড়ায় ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম । আমাকে ক্ষমা কর।'

'আমি বুঝেছিলাম।' মিলান চোখ বন্ধ করল।

'তার মানে ?'

হারাধন যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন একটা টুকরো আমার সামনে উড়ে এসেছিল। ছবির একটা পা। এত কুৎসিত পা আমার নয়। দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ওটা অন্য কারো ছবি।' মিলান হাসল।

'আশ্চর্য ! বুঝেও তুমি এতক্ষণ কিছু বলনি ?'

'তোমাকে পছন্দ করেছিলাম বলে। এখন ভালবাসলাম।' মিলান হাত ধরল।

'কি বলব !' নীল মাথা নাড়ল, 'এবার তোমাকে নেমে যেতে হবে।'

'কোথায় যাবে ?'

'জানি না।'

'টাকাগুলো তুমি রাখো।' ব্যাগে হাত দিল মিলান।

'না।'

'কেন ? তোমার লাগবে।'

'আমি হারতে চাই না।'

'হার ? কার কাছে ?'

'কারো কাছে।'

মিলান ঠোঁট কামড়ালো। নীল বলল, 'ভাল থেকো। সব অস্বীকার করবে। যা দায় সব আমার ওপর চাপাবে।'

'আগে পারতাম, এখন— ।'

'পারতে হবে মিলান।

'কবে দেখা পাব তোমার ?'

'কেন ?'

'আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব ?'

'কতদিন ?'

মিলান আকাশের দিকে তাকাল। ফিসফিস করে বলল, 'জানি না, জানি না।' তারপর ধীরে ধীরে ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়াল, 'থ্যাঙ্কু, থ্যাঙ্কু নীল।'

'কেন ?'

'তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে যাচ্ছ তাই।' মাথা নেড়ে মিলান হাঁটতে লাগল ওদের বাড়ির দিকে। সেইসময় উল্টোদিক থেকে একটা পুলিশের জিপকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল যোশীদের ফ্ল্যাটের দিকে। একজন পুলিশ অফিসার জিপ থেকে নেমে মিলানকে ডাকলেন। মিলান সেটা না শুনে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ অফিসার ওর পেছন পেছন হাঁটছেন। মিলান দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল। নীল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, 'হাওড়া চলিয়ে।'

মাথা সিটে এলিয়ে নীল বসেছিল। হঠাৎ ড্রাইভার বলল, 'সাব, ওহি পুলিশকা জিপ পিছু আ রহা হ্যায়।'

চমকে পেছনে তাকাল। জিপটা বেশী দূরে নেই। ওরা কি করে জানল কে ট্যাক্সিতে আছে? তবে কি মিলান ওদের বলে দিয়েছে? এত কথার পরে মিলান তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? তাহলে অঞ্জনার গল্পটাও ও বানিয়ে বলতে পারে। মাথার ভেতর গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। তার মনে হল এগুলো সত্যি কিনা জানতে অঞ্জনার কাছে যেতে হয়। জীবনের ফেলে আসা দিনের সত্যি যাচাই করতে গেলে আবার উল্টোপথে হাঁটতে হয়। কিন্তু জীবন তার সময় দেয় না। তাকে এখন এগিয়ে যেতে হবে পেছনের পুলিশ-জিপটাকে আরও পেছনে ফেলে। সে বলল, 'ড্রাইভারজী, জলদি চলিয়ে।'

ড্রাইভার বলল, 'ওহি জেনানাকে লিয়ে আপকো দের হো গিয়া।'

ঠিকই। নারীর জন্যে পুরুষের সবসময় দেরী হয়ে যায়। কিন্তু দেরী মানেই শেষ নয়। সে পকেট থেকে একশ টাকার নোট বের করে সামনের সিটে ফেলল। ট্রাফিক সিগন্যালে ট্যাক্সি দাঁড়াতেই ঝটপট নেমে পড়ল রাস্তায়।

শেষ নয়, শেষের খুব কাছ থেকে যদি ফিরে যাওয়া যায়।